গদ্যসঞ্চয়ন

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৯

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড
কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্-স্নাতক বাংলা পাঠপর্ষৎ
আশুতোষ ভট্টাচার্য (সভাপতি), কালীপদ সেন, অনন্তকুমার চক্রবর্তী,
জগদীশ ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
ভূদেব চৌধুরী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সোমেন্দ্রনাথ বসু।

মুদ্রক :—শ্রীমনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩।১, হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯।
O. P. 205

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্-স্নাতক বাংলা পাঠ পর্ষদ (Board of Undergraduate Studies in Bengali) স্নাতক পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য বাংলা বিষয়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই অনুযায়ী 'গদ্যসঞ্চয়ন' প্রকাশিত হইল। প্রচলিত পাঠ্য প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের প্রবন্ধ লেখকদিগের রচনার কোন নিদর্শন থাকে না; অথচ ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই যে রচনার এবং চিন্তাধারার মৌলিকতার স্বাক্ষর আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেইজন্য এই সঙ্কলনে সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখকের রচনাও গৃহীত হইল। তবে স্থানাভাবের জন্য সাধারণত ১৯১০ সনের পূর্বে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদেরই রচনা ইহাতে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। ছাত্রদের প্রয়োজনে কোন কোন প্রবন্ধ কিছু কিছু সম্পাদন করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে। প্রাক্-স্নাতক বাংলা পাঠ পর্ষদের সকল সদস্যই প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রবন্ধ নির্বাচনের কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

এই সঙ্কলনে যাঁহাদের প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের প্রকাশকদের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সিমলায় আতঙ্ক

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)

১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে সিমলাতে সংবাদ আইল যে, সিপাইদের বিদ্রোহে দিল্লী ও মীরাটে একটা ঘোরতর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠতে কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ জেনারেল আন্সন্[১] দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোড়ায়[২] চড়িয়া সিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। সিমলার অতি নিকটবর্তী স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য ছিল, তিনি যাইবার সময় সেই গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, 'গুর্খা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিও।' গুর্খারা নির্দোষ, তাহাদের সঙ্গে সিপাহিদিগের যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই। সাহেবেরা জানেন যে, কালা সিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্খাদিগকে নিরস্ত্র করিবার হুকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্খাদিগকে বন্দুক রাখিতে হুকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, বন্দুক রাখিল না ; পরন্তু তাহারা ইংরাজ অফিসারদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠতে সিমলা আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল।

এই সংবাদে সিমলার বাঙ্গালীরা তাহাদের পরিবার লইয়া উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। একজন বাঙ্গালী আসিয়া আমার

---

১. জেনারেল আন্সন—"কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ জেনারেল আন্সন্ সিপাহী বিদ্রোহের এক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসেন। দিল্লী অভিযানের পথে কর্ণালের (Karnal) নিকটবর্তী একস্থানে কলেরায় ইহার মৃত্যু হয়। ইনি বিশেষ সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন না।" দ্রষ্টব্য—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪০৩ (১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ)

২. অর্থাৎ Country pony তে।

এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এমন সঙ্কট সময়ে তুমি এখান হইতে কোথায় গিয়াছিলে?' বলিল যে, 'একটা দরজি আমার কাপড় সেলাইয়ের দর চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল।'

আমি এখন সেই দোলায় চড়িয়া ডগশাহী নামক আর-একটা পর্বতে চলিলাম। সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে বসিল, এবং তাহারা পরস্পর কথাবার্তা ও হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, 'ইহারা হয় তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। ইহারা এখন এই জনশূন্য অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবে না।' এ কেবল আমার মনের বৃথা আতঙ্ক। তাহারা জল পান করিয়া পুনর্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরোয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম, এ বা আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?' আমি বলিলাম, 'না, এখনো এখানে আসে নাই।' আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম, এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম, তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্বতে আসিয়া সেই গৃহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্প বৃষ্টি হইল; আর সে ঘরের ঘরত্ব থাকিল না,

ভাঙ্গা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার সেই বনবাসে দিনরাত্রি কাটিয়া যাইত।

কাবুল লড়াইয়ের ফেরতা ঘোষজা ও বসুজা দুই জন ডগশাহীতে এখন ডাকঘরের কর্ম করেন। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন। বসুজা বলিলেন, 'আমি কাবুলের লড়াই হইতে বড় বেঁচে এসেছি। পলাইয়া আসিবার সময় কাবুলের পথে একখানা শূন্য ঘর দেখিতে পাইয়া আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং একটা মাচার উপর উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। সেখানে কাবুলীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া মারে আর কি! অনেক কষ্টে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আবার এখন এই বিপদ!'

আমি সেখানে যে কয়দিন ছিলাম, প্রতি দিন ঘোষজা আমার তত্ত্ব লইতেন। আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঘোষজা, আজিকার খবর কি?' তিনি বলিলেন, 'আজিকার খবর বড় ভাল নয়। আজ সব ডাক জ্বালাইয়া দিয়াছে।' তাহার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঘোষজা, আজিকার কি খবর?' বলিলেন, 'আজিকার বড় ভাল খবর নয়। আজ জলন্ধর হইতে বিদ্রোহীরা আসিতেছে।' ঘোষজার নিকট হইতে একদিনও ভাল খবর পাওয়া যায় না। তিনি প্রতি দিনই মুখ ভার করিয়া আসেন। আমি এইরূপে অতি কষ্টে এগারো দিন অতিবাহিত করিলাম।

এখন সংবাদ আইল যে, সিমলা নির্বিঘ্ন হইয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আমি সিমলা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনিলাম কুলি নাই, ওলাউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। একটা ঘোড়া পাইলাম। সেই ঘোড়াতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দুর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। কিশোরীকে আর আমার সঙ্গে পাইলাম না। সেই আবরণহীন পর্বতে তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছে। একটু ছায়ার জন্য আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি বৃক্ষ নাই যে আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ

শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর-একটি মানুষ নাই যে একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলিয়া একটি বাঙ্গালা পাইলাম। ঘোড়াটিকে একস্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈবক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি সমদুঃখে দুঃখী হইয়া আমার জন্য একটু মাখন ও তপ্ত আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় সিমলাতে পঁহুছিলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছি, 'কিশোরি, আছ এখানে? এখানে কি আছ?' দেখি যে কিশোরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

আমি ডগশাহী হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে[৭] সিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮)

---

৭. ৩০শে মে ১৮৫৭

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

—শাকে[১], কার্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার[২] রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও আবশ্যক হয় নাই।

তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, বীরসিংহ বাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব তথাপি

---

১. পাণ্ডুলিপিতে শাকের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, পরে, কাগজপত্র দেখিয়া বসাইয়া দিবার অভিপ্রায় ছিল।—সম্পাদক

শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে, সময়ে সময়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য, না করিতে পারিতেন, এমন কর্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্বোধের কার্য করিতেন, যে তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্বদা, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, এ-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। একদিন তিনি একস্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন; ঐ স্থানে, লোকে মল ত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়, ও-স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎক্ষণ, স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্য পক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাচী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও কোন বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে ; কিন্তু তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না ; এবং কোন বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল ; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেল-সেলামী পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব

ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, বটে; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে, পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে সময়ে সময়ে, পিতামহদেবের সংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূল বৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

'বিদ্যাসাগর চরিত' (স্বরচিত—১৮৯১)

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতের অতি উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র আছে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহা আমার জানা নাই। সমাজতত্ত্ব ইউরোপের একটি নূতন শাস্ত্র। উহা ইতিহাসমূলক বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসমূলকও বটে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে ঐ শাস্ত্রে এখনও কল্পনার প্রভাব বলবান। এখনও উহাতে লেখকের যদৃচ্ছাসম্ভূত মতামতগুলিই সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ হয়। যাহা সার্বভৌমিক সমাজসূত্র বলিয়া নির্ণীত তাহাও সর্বস্থলে দেশবিশেষের সমাজসূত্র নয়।

বস্তুতঃ ভারত-সমাজের ভাবী অবস্থার অনুমান করিবার জন্য মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা লইয়াই বিচার করিতে হয়; অপরাপর দেশের ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বাভিহিত গ্রন্থাদি হইতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। ঐ ইতিহাসাদি হইতে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের সূত্র গ্রহণ করা, অথবা এই সমাজের পরিণতির নিয়মাবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ভারতবাসীর সমাজতত্ত্ব অপর একটি কারণেও ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ত্ব হইতে ভিন্নরূপে বিচার্য।

সমপ্রকৃতি কোন একটি মাত্র বস্তুতে পরিণতি সংঘটন হয় না। বিভিন্ন বস্তুর সমবায় হইতেই পরিণতির প্রবৃত্তি হয়। এ নিয়মটি জাগতিক সকল কার্যের পক্ষেই খাটে। বাহ্যব্যাপারেও যেমন একাধিক দ্রব্যের সমন্বয়েই দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ কার্যেও একাধিক ভাবের সমবায়ে ভাবান্তর আইসে। সামাজিক পরিণতিও এই নিয়মের অধীন। প্রতি

সমাজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন-প্রকৃতিক লোকসকল বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অভ্যন্তরে বিবিধরূপ পরিবর্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্তস্রোতঃ চিরকাল সমান বেগে চলে না। সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের অভ্যন্তরে বহু পরিমাণেই সাম্যাবস্থা অবস্থাপিত হইয়া যায়।

তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে একটি সমপ্রকৃতিক বস্তুর ন্যায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত চলে না। কিন্তু যদি ঐ সাম্যাবস্থ সমাজের মধ্যে কোন নূতন লোকের অথবা নূতন ভাবের সমাগম হয়, তবে সেই ভিন্ন উপাদানের সংযোগে আবার পরিণতির বেগবত্তা জন্মে ও পুনর্বার সাম্যাবস্থার প্রাপ্তি পর্যন্ত পরিবর্তস্রোতঃ চলিতে থাকে।

সাম্যাবস্থার এবং পরিবর্তের এই পর্যায়ক্রম ভারতভূমিতে অতি বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারত-সমাজের উপাদান মূলতঃই অতি বিভিন্ন প্রকৃতিক; তদ্ভিন্ন, এদেশের ধনবত্তার বিপুল খ্যাতি বহুকালাবধি বৈদেশিকদিগকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অথবা বিজিগীষায় এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছে। এইজন্য ভারত-সমাজের পরিণতি-কার্য বহু পূর্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে এবং কখনও স্থগিত-গতি হইতে পারে নাই। অন্যান্য প্রাচীন জাতীয়েরা কেহ বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ বা বহু কালাবধি কোন নূতন উপাদানের সমাগম অভাবে অপেক্ষাকৃত নিশ্চলভাবেই আছে। তাহাদের তুলনায় ভারতসমাজের পরিণতিসূত্র যে সাতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ঐ সূত্র সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া যে উহার সহিত নব্য ইউরোপীয়দিগের পরিণতিসূত্রকে জুখিয়া কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট, অবধারিত করিতে পারা যায়, তাহা নহে। যদি সকল সমাজের পরিণতি একই প্রণালীক্রমে নির্বাহিত হইত, তাহা হইলেই ঐ প্রকার জোখা দেওয়া চলিতে পারিত. এবং তাহা হইলেই কোন্ সমাজ অগ্রবর্তী এবং কে বা পশ্চাদ্বর্তী, তাহা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সকল মনুষ্যসমাজের পরিণতি-ব্যাপার একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। যেমন বাহ্য ব্যাপারে

দেখা যায়, দ্রব্যের উপাদানের ভিন্নতা নিবন্ধন সমুৎপাদিত মিশ্রপদার্থের ভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ সামাজিক উৎপাদনের ভিন্নতা হইতেও সামাজিক পরিণতির প্রকারভেদ হয়। ভারতসমাজের প্রধানতম উপাদান—কল্পনা-প্রবণ বিবিধ অনার্য জাতি এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-বোধে পটুতম আর্যগণ। ইউরোপীয় সমাজের উপাদান—রোমীয়দিগের শাসনগুণে একীভূত সুসাহসিক কেল্টীয় লোক এবং সাতিশয় স্বাতন্ত্রিক এবং স্বৈরস্বভাব টিউটোনীয় বর্বরগণ। এইরূপ অতি বিভিন্ন-প্রকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত সমাজদ্বয়ে মূলতঃই ভেদ থাকায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে নাই। শুদ্ধ উপাদানের ভিন্নতাও নহে—ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের স্ব স্ব উপাদানের বিনিবেশও ভিন্নরূপ হইয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজের নিম্নস্তরে রোমের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, উপরিস্তরে রোম-বিজেতাদিগের বর্বরতা; ভারত-সমাজের নিম্নস্তরে অনার্যদিগের বর্বরভাব, উপরিস্তরে আর্য-সভ্যতার সমাবেশ। এরূপ স্তরবিন্যাসের ভেদ হইতেও পরিণতি-সূত্রের ভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সহিত অন্য কোন প্রাচীন অথবা নব্য জাতীয়ের সর্বাঙ্গীণ উপমান-উপমেয়-সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে না। এবং সেইজন্য ইউরোপীয় সমাজের সূত্র ধরিয়া ভারত-সমাজের পরিণতির বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাই করা হয় বলিয়া, সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে। এমন কি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারত-সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরোপের পশ্চাদ্বর্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু বিগত শতাব্দীর অনুরূপ। অপর কেহ বলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে এখনও জাতীয়ভাব পর্যন্ত জন্মে নাই।

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ রোম সাম্রাজ্যের উপরিস্তরে বর্বর জাতীয়-দিগের অবস্থান, ভারতবর্ষে বর্বরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকের উপরিভাগে আর্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্ত্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্য। কিন্তু তজ্জন্য ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে

পশ্চাদ্বর্তিতা সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভারতসমাজের পরিণতি ভিন্নপথে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখানেও যোদ্ধৃদশা জাজ্জ্বল্যমান, সকল ইউরোপীয় লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাজস্বের অর্ধাংশ সৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্ত্র নির্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। ভারতসমাজের ঐ ভাব যদি কখন হইয়া থাকে তবে যখন একটি স্বতন্ত্র যোদ্ধৃজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়াছে— ইউরোপের সকল লোকই ভোগ-সুখ-লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত-সমাজের ঐ অবস্থা চতুরাশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই— ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয়নিষ্ঠুর-স্বভাব এবং অকারণ প্রাণি-বধে উদ্যতহস্ত। ভারতসমাজে যখনঅহিংসাই পরমধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন হইতেই ঐরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ অপর সমুদায় ভূ-ভাগকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের ছেলের মুখের গ্রাস নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যদি কখনও ঐভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবাসী অন্যের অন্নে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের তুলনা হইতে পারে না। তবে ইউরোপের কল-কারখানা বাড়িয়াছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান-বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্বাঙ্গীণতা বা পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সবপ্রধান কর্তব্য, অর্থাৎ সমধিকসংখ্যক লোকের সুপালনে, ভারতসমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের অপেক্ষায় ন্যূন ছিল না—এখনও ইউরোপ অপেক্ষা ন্যূন হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারতসমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য-হৃদয়ের খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু উহা সর্বোচ্চ ভাব নয়। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। উহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব; আবার

কোনো ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ভাব। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় পণ্ডিতেরা ইহার উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত বড় বড় লোক, সকলেরই হৃদয় এইভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ঐরূপ। উঁহারাও স্বদেশ এবং স্বজাতিবাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়েরা যতদূর করিতেন, ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান; ইহার শাখাপ্রশাখা এবং পত্রবিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর; ইহার কাণ্ড পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ, ইহার ফল-পুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটি দোষেগুণে জড়িত উপধর্ম মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জাতীয় ভাবটিকে উপধর্ম বলিয়া নিন্দাও করেন নাই, আর উহাকে পরমধর্ম বলিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাঁহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদ মস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আর স্বজাতীয় আর্যগণকেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ-আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃ-শরীর প্রসূত বলিয়াছেন; আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিয়াছেন—পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সর্বত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসকলের প্রকৃত মর্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতিসোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

জাতীয় ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ

প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্যন্ত। আবার পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক-ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগস্ট কোম্‌টির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্যন্ত। (৮) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য ধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে, আবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব সেটি আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীররক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্বজনীন প্রীতিকে হৃদয়নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃ-পুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্রসহায়ে আপনার রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যে কুশিক্ষাজন্য স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্মসমাজকেই ধর্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে এই স্বজাতি বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল ঐ সকল কার্য সত্যাবলম্বনে সতেজে, সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্বজনীন প্রীতি পুনর্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকশিত হইবে।

তখন সর্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর-জাতি-বিদ্বেষ এবং পর-জাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।

'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)

সেকালের ইংরাজী শিক্ষা

রাজনারায়ণ বসু

যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল[১] তখন ইহা পরিবর্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুল মাষ্টর। প্রথমে তাঁহার বেশভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ, কদাকার শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে করে দেখুন দেখি, প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়! সর্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে, টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুল মাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুল মাষ্টর" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান্ আর কেহ নাই। Grammmar, Logic ও Rhetoric অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic ইত্যাদি। লোকে বলিত "রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ"; যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম। তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল।

---

১. ইহার পূর্বে লেখক বাঙালী-সমাজে কবিওয়ালাদের প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। —সম্পাদক।

বিবাহসভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Nebuchadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Xerxes? ঐ সকল শব্দ ও Xenophon, Kamschatka প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত। তখন ঐরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, "What denomination put your papa?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—(এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ)

গাড (God)	ঈশ্বর।
লাড (Lord)	ঈশ্বর।
কম (Come)	আইস।
গো (Go)	যাও।
আই (I)	আমি।
ইউ (You)	তুমি। ইত্যাদি।

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা, Well—আচ্ছা, ভাল, পাতকো; Bear—সহ, বহ, ভল্লুক। সে কালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একেবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল, ফ্লোর (Flour) ময়দা, ফ্লোর (Floor) মেজে। তাঁহারা "Flower", "Flour" ও "Floor" এই তিন শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করিত। তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন। মনে করুন, ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার। তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুল মাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব? গ্যাডেন (Garden)

ঘোষাব, না স্পাইস (Spice) ঘোষাব?" ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, "পম্‌কিন্ (Pumpkin) লাউ কুম্‌ড়ো"; অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, "পম্‌কিন্ —লাউ কুমড়ো।"—সর্দার পোড়ো বলিল, "কোকোম্বর (Cucumber) শসা;" আর সকলে অমনি বলিল, "কোকোম্বর শসা।" সর্দার পোড়ো বলিল, "ব্রিঞ্জেল (Brinjal) বার্ত্তাকু;" আর সকলে অমনি বলিল, "ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু।" সর্দার পোড়ো বলিল, "প্লোম্যান (ploughman) চাসা," আর সকলে অমনি বলিল, "প্লোম্যান চাসা।" এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।

পম্‌কিন্ লাউ কুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল্ বার্ত্তাকু, প্লোমেন্ চাসা॥

কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী,—তাল ঠুংরি।

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি কাছে।

কট্ (Cut) কাট্, কট্ (Cot) খাট্, ফলোয়িং (Following) পাছে।

এ ছাড়া আবার "আরবি নাইটের পালা" হইত, অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

"The Chronicles of the Sassanians
That extended their dominions."

এইরূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ

হইয়াছেন। সরকার বলিল মাষ্টর ক্যান্ লিব্, মাষ্টর ক্যান্ ডাই। (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব, "What, master can die ?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঁচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ দেয়ার" (Stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্ল্যাক ষ্টোন ডাই, মাই ফোরটীন জেনারেষণ ডাই।" (If master die, then I die, my cow die, my black-stone die, my fourteen generation die।) "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু[২] মরিবে, আমার ব্লাক ষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালাগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটীন জেনারেষণ অর্থাৎ চৌদ্দ-পুরুষ মরিবে।" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কেন আইস নাই ?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, "চর্চ"[৩] (Church)। রথের আকার গির্জার মত, তাই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, "উডেন চর্চ" অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই।" (Three stories high), "গাড আলমাইটী সিট্ আপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ"

২. এই দেশে কাউ শব্দের ভাগ্য তিনবার পরিবর্তিত হয়। প্রথমে উহার উচ্চারণ কো ছিল, পরে কৌ হয়, তাহার পর এক্ষণে কাউ হইয়াছে। (লেখকের মন্তব্য)

৩. এই শব্দে যে কয়েকটি 'চ' আছে, তাহা তালব্য বর্ণরূপে উচ্চারণ না করিয়া জিহ্বামূলীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং দীর্ঘায়ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সরকার যেরূপে শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, সেইরূপ হইবে। (লেখকের মন্তব্য)

(Long long rope), "থৌজণ্ড মেন ক্যাচ" (Thousand men catch), "পূল পূল পূল" (Pull, pull, pull), "রনাওয়ে রনাওয়ে" (Run away run away), হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।"

ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দশা হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ জন্ হাইড ইষ্ট (Sir John Hyde East) এবং ডেবিড হেয়ার (David Hare) এই মহাত্মাদ্বয় প্রথমে ঐ কালেজ সংস্থাপিত করেন। এই দুই লোকহিতৈষী উদারাশয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্নে হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয় এতদ্দেশীয়দিগের টাকায় সংস্থাপিত হয়। প্রথমতঃ কেবল এতদ্দেশীয়গণ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাঁহারাই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা উপযুক্তরূপে উহার অধ্যক্ষতা কার্য নির্বাহ করিতেন। পরে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উহার কার্যভার বিশেষ ইংরাজী কৌশল প্রয়োগ দ্বারা কাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয় ও সেই ভাব এখনও কার্য করিতেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্তমান পরিবর্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনা যে উহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় এই সত্য প্রতি-পাদন করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর একমাত্র নিরাকার। তাহাতে অনেকে এইরূপ মনে করিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম একবারে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহা দ্বারাই হিন্দুধর্ম প্রকৃত রূপে রক্ষিত হইবে।

আমরা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজে

থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে একদিন কালেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এতদূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে, ললাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বাবু! এ ইড়িবিড়ি করা নয়, বাঙ্গালার ঘানি।" একবার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্থ অবস্থায় আমার বাসায় একদিন আসিয়া বলিলেন, "আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।" আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সমাচার?" তিনি বলিলেন, "সোমপ্রকাশাদি সম্বাদ পত্রে নাকি আন্দোলন হচ্চে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তা হলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।" তিনি একবার এক সভায় "অভিনন্দন-পত্র" শব্দের পরিবর্তে "রঘুনন্দন-পত্র" বলে ফেলেছিলেন। ঐ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! এই শব্দের উচ্চারণ ব্রাঘ্‌ঘ না?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "উহার উচ্চারণ ব্যাঘ্র।" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "আমি তাই ত বল্‌ছি—ব্রাঘ্‌ঘ ব্রাঘ্‌ঘ।" উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে বকৃযু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি "বকৃযু" শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। যদি "বকৃযু" লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে, কি মূর্খ! "কষ" এইরূপ না লিখিয়া "ক্ষ" লিখিলেই হইত, আর যদি "বক্ষু" লিখেন তাহা হইলে লোকের "বক্‌খু" উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া

তিনি ইংরাজী অক্ষর x-এর সাহায্য লইয়া "বক্স্" এইরূপ লিখিলেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা কালেজে পড়িতেন, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিদ্যা এইরূপ ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ বড় দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃতের চর্চা তদ্রূপ হইতেছে না। বাগ্‌দেবী সরস্বতী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর তীরে আশ্রয় লইয়াছেন। বাগ্‌দেবীর এরূপ অন্তর্ধানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ভট্টাচার্যদের দুর্দশা। তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের স্ত্রীর ছিন্ন বস্ত্র, চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই; এক এক লোকের হয়ত অনেকগুলি ছেলে; কি করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিবেন ভাবিয়া অস্থির! এই উৎকট দণ্ড তাঁহারা কেন প্রাপ্ত হইতেছেন? কেবল সংস্কৃত চর্চা করেন বলিয়া। জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ভাষা। সর্ উইলিয়ম জোন্স বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা "More copious than the Latin, more perfect than the Greek and more exquisitely refined than either."—এই সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষা করান বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়েরা আমাদের নিকট হইতে এই ঘোরতর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা যথার্থ বিদ্যা উপার্জন যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না। শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহার প্রধান কারণ। যেরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হইতে পারে না। আমি স্বয়ং কোন স্কুলের হেড মাষ্টর ছিলাম। আমি করিতাম কি, না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের অর্থ একেবারে বলে দিতাম না, প্রশ্নকৌশলে সেই স্থানের প্রকৃত অর্থটি তাহাদিগের মুখ দিয়া বাহির করাইতাম। আর কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপে পড়ানোতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমার নিন্দা হইতে লাগিল। আমার একটি বন্ধু, তিনিও নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন; তিনি আমাকে দাদা দাদা

করিতেন। তিনি আমাকে একদিন বলিলেন, "দাদা! তুমি ভাল কচ্ছো না তোমার দুর্নাম হচ্ছে—ছেলেদের গেডিয়ে দেও," (অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও)। "আজকাল না গেডাইলে কোন মতে পরিত্রাণ নাই।" মানসিক বৃত্তি পরিচালনা না করিয়া পড়ার পক্ষে (Key) কী-গুলি বড় সুবিধাজনক। এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে সিঁধ কেটে ঢুকা ভাল, তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বার খোলা কর্তব্য নয়। ছেলেরা যাহা কীতে আছে, তাহাই অবিকল মুখস্থ করে। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখে, যাহা লিখিয়াছে, তাহা কীর সহিত মিলিয়াছে কি না? একবার এক বালক এইরূপ মিলাইবার সময় দেখিল, একটা "The" ভুল গিয়াছে, তাহার জন্য মহা দুঃখিত। ভূগোল গ্রন্থে অনেক সমান বর্ণনা থাকে বলিয়া Ditto শব্দ লিখিত থাকে। এক বার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, যাহার Ditto সে বিষয় লইয়া প্রশ্ন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু যে বিশেষ তত্ত্বটির পার্শ্বে Ditto লিখিত আছে কেবল সেই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটি বালক Ditto এই উত্তর লিখিয়াছিল। আমাদিগের দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি বলেন যে, ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া আইসে না, বমি করিয়া আইসে। কথাটি শুনিতে কিছু অশ্লীল, কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক্। গেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। পূর্বে হিন্দু কালেজে কোন নির্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত না ও এ গ্রন্থের একটু, ও গ্রন্থের একটু, এরূপ করিয়া পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে নিজে কতই পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা নিজে যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে শিক্ষক যাহা পড়াইতেন, তাহা অতি অল্প, বলিতে হইবে। এক্ষণকার এণ্ট্রান্স কোর্স, ফার্ষ্ট আর্টস্ কোর্স ও বি, এ, কোর্স সমস্ত একত্র কর, কত বড় বই হইবে? ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে কি বিদ্যা হইতে পারে?

'সেকাল আর এ কাল' (১৮৭৪)

মনুষ্যফল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ —মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ব হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ব হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই, নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছাহেব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা

কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যা-ভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পোনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সার্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলা আম এমন কদর্য যে পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলা জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্যন্ত

সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্মুখ—আমি ইহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। কচি কচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে —যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষ পথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায় ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে, পুকুরের পাকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর।

যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন; মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়ো বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল্ বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্‌ড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার ;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণণা করিবে ?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।[১]

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে ?

---

১. কমলাকান্ত বোধহয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে ; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড !—ভীষ্মদেব। (মূলগ্রন্থের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য)

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতামাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্শূন্য ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইঁহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি

সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাও জ্বালিয়া ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় দায় ধারিতে হয় না—আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না।

আর একটী মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিকর্ষ, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ

তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকল্ ভিন্ন কেহ বিশেষরূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বকলের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্যগণ অনার্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত; আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ

ও চৈনিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্ত সৌধমালাশোভিত মহানগরীসকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন একদিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর একদিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্যনাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল,

প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন, আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ,

বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্নসমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্বকবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকট-বর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.

'বিবিধ প্রবন্ধ'—(১৮৮৭)

পাখীটি কোথায় গেল ?

চন্দ্রনাথ বসু

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন?' সে বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?' আমি কখনও পাখী পুষি নাই। পাখী পুষিতে কখনও সাধ হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড়ই ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখনও পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?'—কি জানি কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল, মনে হইল বুঝি আমি পাখীটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কতই কষ্ট দিবে—পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব-আনন্দভরে পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—আবার অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব-আনন্দভরে তাহাকে আরো কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তায় আবার দেখিলাম যে পাখীটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে জড়সড় হইয়াছে, বুঝিবা কতই আকুল হইয়াছে, বুঝিবা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে।

বড় দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—'পুষিব'। মানুষটি বলিল, 'আটটি পয়সা পাইলেই পাখীটি দি।' পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং

এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটী দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না; সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান ছিল। ভারিগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত। যখন জলের এই প্রকার দুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরাকৃতি অতি ভয়ঙ্কর ছিল। এখনকার ফুটপাথের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটী সুবিস্তীর্ণ নর্দামা ছিল। কোন কোনও নর্দামার পরিসর আট দশ হাতের অধিক ছিল। ঐ সকল নর্দামা কর্দম ও পঙ্কে এরূপ পূর্ণ থাকিত, যে একবার একটী ক্ষিপ্ত হস্তী ঐরূপ একটী নর্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্দ্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্দ্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটী শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত না করিয়া সেইসকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপদ্রবে দিন রাত্রির মধ্যে কখনই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ করিতে পারা যাইত না। এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "রেতে মশা দিনে মাছি,
> দুই নিয়ে কল্‌কেতায় আছি।"

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, পূজা পার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন

এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাইজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাইজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না।

এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমব্রিকের বনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটা পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত! এবিষয়ে সহরে অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া কাঠ-

ঠোক্‌রার পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয়ে প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে "কড়ড়্‌ ঠক্‌" করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুক্‌রাইয়া দিল!

কবি, পাঁচালী ও বুলবুলীর লড়াই এর একটু বর্ণনা আবশ্যক। কবির গান সচরাচর দুইদলে হইত। কোনও একটা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন কৃষ্ণ-পক্ষ আর এক দল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও সহরে অনেক বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান; বাল্যকালে কুসঙ্গে

পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টনী একবার গান বাঁধিল;

"ও মা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী।" তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল,

"যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে।" ইত্যাদি।

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্বদাই হইত। হাপ আকড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্রপরিবারের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া নানা বাদ্যযন্ত্রসহ গান করিত।

পাঁচালীর ব্যাপার অন্যপ্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল গায়ক স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে, পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণন করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটী গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালীওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালী গায়কদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক পাঁচালী গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাঁচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে এখন আমাদের আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া

বহু সংখ্যক বুলবুলী পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউস-ঘুড়ী, মানুষ-ঘুড়ী প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন।

সহরের লোকের ধর্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতে উদ্ধৃত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোল যাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল। লোকে মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষ রূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন তাঁহারা

কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন, এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া, পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধন দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য-দিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি দিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ।"

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত।

পাষাণের কথা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

পুরাণ কথা কে বলে, বলিবার লোক নাই। বুড়া মানুষে না হয় ১০০।১৫০ বৎসরের কথা বলিল, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেখায় পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিসে লেখা হয় সে ত আর বেশী দিন টিকে না। কাগজ ৮।৯ শত বৎসর টিকে, তালপাতা ১২।১৪ শত বৎসর টিকে, ভূর্জ্জিপত্র ১৫।১৬ শত বৎসর টিকে, পেপিরস না হয় দুই হাজারব ৎসর টেঁকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে শুনিব। পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাও আবার সকল পাথরে হয় না। বেলে পাথর ৫০।৬০ বৎসরে ক্ষইয়া যায়। অনেক শক্ত পাথরে চটা উঠিয়া যায়। কেবল দুই প্রকার পাথরে আঁক চিরকাল থাকে। এক রকম পাথর আগুনের তাতে গলিয়া যায়, তাকে ধাতু কহে ; আর এক রকম পাথর কিছুতেই গলে না, ক্ষয় হয় না, তাহাকে পাষাণ বলে। পুরাণ কথা শুনিতে গেলে এই পাষাণকে কথা কহাতে হয়, নহিলে পুরাণ কথা শুনিবার উপায় নাই।

অন্যদেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা সেখানকার পণ্ডিতেরা যে সকল পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বারবার নকল হইয়া আজ পর্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক পুঁথি আসিয়া পঁহুছিয়াছে ; তাহাতেও আছে সবই,—যাগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, কানুন আছে, চিকিৎসা আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যাকরণ আছে, কাব্য আছে, অলঙ্কার আছে, বিজ্ঞান আছে—আছে সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ কথা। পুরাণ কথা আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভাল-বাসিতেন না ; এ কথাটী কহিতে ঋষিদের মুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ,

কবিদেব মুখ বন্ধ, দর্শনের মুখ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জ্যোতিষের মুখ বন্ধ। সুতরাং আমাদেব দেশে পুবাণ কথা যদি শুনিতে চাও তাহা হইলে পাথরকে কথা কহাও, নহিলে ভাবতেব পুবাণ কাহিনী বলিবাব আব লোক নাই।

পাষাণ বড় শক্ত জিনিস, বাহিবও শক্ত ভিতরও শক্ত, কথা কহিতে গেলে শব্দ কবিতে হয়। শব্দ ফাঁপা জিনিস ভিন্ন হয় না, অথচ পাষাণ নিরেট। ন্যায়শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশেব গুণ; পাষাণের মধ্যে আকাশ থাকিতে পারে না; সুতরাং পাষাণকে কথা কহান বড় শক্ত ব্যাপার। আকাশ ত আকাশ! পাষাণের উপর বাটালিও চলা কঠিন। সে কালের রাজা রাজড়ারা বাটালি দিয়া কুঁদিয়া পাষাণে দুই চারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পাষাণ তারই প্রতিধ্বনি করে মাত্র। যখন হাজার হাজার বৎসর পরে বাটালির দাগ মিলাইয়া যাইবে, তখন প্রতিধ্বনি বন্ধ হইবে; ইতিমধ্যে পাষাণ তোমায় দু চারিটী কথা শুনাইতে পারিবে। আমাদের দেশময় অনেক অনেক জায়গায় পাষাণে এইরূপ বাটালি কাটা লেখা আছে। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশের পুরাণ ইতিহাস।

পাথরের কথা বুঝিবাব ক্ষমতা সকলের থাকে না, আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না। অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে প্রিন্সেপ সাহেব পাষাণেব ভাষার অক্ষব-পরিচয় আরম্ভ করেন। তারপর কীটো, কনিংহাম, বিউলাব প্রভৃতি বড় বড় সাহেববা সে ভাষা বুঝিতে শিখেন। এগন এদেশের লোক অনেকে পাষাণের কথা কহিতে পারে, পাষাণের কথা বুঝিতে পারে ও লোকজনকে বুঝাইতে পাবে। কিন্তু পাষাণ অতি অল্প কথা কয়। একখানি শিলাপত্রে একটীমাত্র ঘটনার কথা থাকে। অনেক শিলাপত্র একত্র না করিলে ইতিহাসপাওয়া যায় না। শিলাপত্রও আবার এক জায়গায় থাকে না। কোনখানি হিমালয়ে, কোনখানি বিন্ধ্যপর্বতে, কোনখানি উরুবেলায়, কোনখানি আবার সুদূর নীলগিবিতে। এ সকল সংগ্রহ করা বড় পবিশ্রমের কাজ। ইংরেজের নাকি বড় রাজত্ব, প্রচুব ক্ষমতা এবং অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা; তাই তাঁহারা এই সমস্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন। যাহা

আমাদের সাধ্যের অতীত, তাঁহারা তাহা সুসাধ্য করিয়া তুলিতেছেন। অনেক বিষয়েই আমরা ইংরেজের ঋণ শুধিতে পারিব না, এ বিষয়ে কিন্তু ইংরেজের নিকটে আমরা অনন্তকাল ঋণী থাকিব। এ ঋণ একেবারে শোধ হইবার নয়।

যখন বৌদ্ধধর্মের বড়ই প্রভাব, তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্মাণ করিত এবং তার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের একত্র মিলন বলিয়া মহা ভক্তিভরে তাহার পূজা করিত, সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর দুই দুইটা থাম মিলাইবার জন্য তিনটী করিয়া সূচী। এমন করিয়া পালিস করিত যে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া পড়িত। প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক সূচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। ভারতবর্ষে এরূপ স্তূপ অনেক ছিল, দুই চারিটী এখনও আছে। এই স্তূপে অনেক পাষাণ আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া অনেক কথা কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথা শুনায়, আমাদের যে গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা আবার মনে করাইয়া দেয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পাষাণের কথা' উপন্যাসের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সংবাদ

শ্রীম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,

আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া বাদুড় বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ী যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ; লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্ণিশকরা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়ীতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে; সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই;—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ-পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক-পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজান আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং; অনেকগুলি চিঠিপত্র; বাঁধানো হিসাবপত্রের খাতা; দুচারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কী লেখা রহিয়াছে? কোনো বিধবা হয়ত লিখিয়াছেন—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু

আমার বহি কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটি চাকরী করিয়া দিতে হবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেই দিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরণে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চটি জুতা। মাষ্টার বলিলেন, আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হইবে না, আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই। বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক-উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ-করা টেবিল। টেবিলের পূর্ব ধারে একখানি পেছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে-পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের

উপর ; পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় এক দৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২।৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরণে থান কাপড়, পায়ে চটিজুতা· গায়ে একটি হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতন কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায় ;—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে, পড়াশুনা করি ; কিন্তু কৈ তা হোলো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না!' দ্বিতীয়, দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন ; শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন, একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ, লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন ; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় নিজে আইবড় ভাতের কাপড় বগলে ক'রে এসে উপস্থিত। পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিতেছিলেন, ঈশ্বর, তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারি মন খারাপ হবে—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী ; নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া

গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ-রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিলেন—মা, এসেছি।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ-জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাবো; দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া এক-জনকে জল আনিতে বলিলেন; ও মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আমুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে-পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্চে না।

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; এইবার সাগব দেখছি।" (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। "তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।" (হাস্য)

শ্রীবামকৃষ্ণ। "না গো। নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র!" (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর। "তা বলতে পারেন বটে।"

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুর কথা কহিতেছেন—"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, যে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোক-শিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি

বিদ্যাদান, অন্নদান করছো; এও ভাল। নিষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত আছই।"

বিদ্যাসাগর। "মহাশয়, কেমন ক'রে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। "আলু পটল সিদ্ধ হ'লে তো নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!" (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। "কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে।"

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণপদকাদি বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজে প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায়গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার তো বোধ হয়,—ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।' হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন; গলায় উপবীত ধারণ করিতেন; বাঙ্গালায় যে-সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে "শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্‌"—ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাষ্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে,

সকলে যদি সেরূপ হয় পৃথিবী স্বর্গ হ'যে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষডদর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "ব্রহ্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান, ভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে; সৎ-ও আছে; অসৎ-ও আছে; ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে; তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ-বা ভাগবত পড়ছে; আর কেউ-বা জাল ক'রছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবাব দুষ্টের উপরও দিচ্চে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে ম'রে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

"ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন—সব এঁটো হ'য়ে গেছে। মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি) "বা। এটী তো বেশ কথা। আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ

থেকে ফিরে এলো ; এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপ! তুমিতো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি? বড় ছেলেটিই বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে ব'লে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো। বাপ চুপ ক'রে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোনো কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বললেন, বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না।

"মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগ্‌লো ; যাবার সময় ভাব্‌ছে—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে'—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক!

"তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কীরকম বলা জানো? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে; কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ওঃ কী দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর-তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

"সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কী বস্তু মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না।

"লুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছলো (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হ'ল না, যাই নামা অমনি গলে যাওয়া! কে আর খপর দিবেক?"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি)। "শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি, কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘি'র কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কল্‌কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখনও গুণ্‌গুণ্ করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়।" (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) "আচ্ছা, তোমার কী ভাব?" বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; বলিতেছেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।" (সকলের হাস্য)।

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন। গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ, দেহ উন্নত ও স্থির, নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা

কহিতেছেন—"ভাব ভক্তি" এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়, দাহিকা শক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

"তাঁকেই 'মা' ব'লে ডাকা হ'চ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিষ কি না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস।

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা-হলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার, যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল, ব্রহ্মচারী বললে এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি! আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোণার খনি। তারপর কেবল হীরা, মানিক! এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।

"নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!" (সকলে নিঃশব্দ)।

সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি, সহাস্যে)। "এ যা বললুম বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বরুণ রাজার খপর নাই।"

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। "তা আপনি বলতে পারেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। "হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য), বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস আছে।"

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। "একবার বাগান দেখতে যাবেন; রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।"

বিদ্যাসাগর। "যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!"

শ্রীরামকৃষ্ণ। "আমার কাছে—ছি! ছি।"

বিদ্যাসাগর। "সে কি! এমন কথা বললেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। "আমরা জেলেডিঙ্গি (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ; কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।" (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন; চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "তার মধ্যে, এ সময় জাহাজও যেতে পারে।"

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। "হাঁ এটি বর্ষাকাল বটে!" (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। নবানুরাগের বর্ষা; নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্ত সঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সঙ্গে দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ, কৃষ্ণাষ্টমী; এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (২য় খণ্ড')।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি

বিপিনচন্দ্র পাল

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ঈশ্বর-ভক্তির অঙ্গ ছিল। ভক্তি বলিতে তিনি মানুষের সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরাভিমুখতা বুঝিতেন। "মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।" এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি. কেননা ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্ম-প্রীতি, স্বজন-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনেরা এই সত্যটা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ।

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি এই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতি-বৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশ-প্রীতি ও সার্বলৌকিক-প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে।"

এই উদার ও বিশ্বজনীন স্বদেশ-প্রীতির আদর্শের উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিয়াছিল।

রামমোহনের মত বঙ্কিচন্দ্রও জীবনের সকল বিভাগে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইহা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতিও এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করিয়াছে। বিরোধ থাকিলেই সমন্বয় করিতে হয়। ধর্মেতে এবং সমাজে আমাদিগের বর্তমান যুগে প্রাচীনে এবং নবীনে একটা তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন-ধর্মে, ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাতে

এবং কৃষ্ণচরিত্রে এই বিরোধের একটা সমীচীন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নবীনকে বর্জন করিতে চাহেন নাই। আবার নবীনের লালসায় প্রাচীনকেও উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনের সনাতন সত্য এবং সাধনার উপরে নবীনের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলেন। সমন্বয়ের একটা সময় এবং অবস্থা আছে। কোন বিরোধ পাকিয়া না উঠিলে সমন্বয়ের সময় উপস্থিত হয় না। দূরদর্শী মনীষীরা প্রয়োজন হইলে পরিণামে এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্যই, আদিতে বিরোধটা পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বিরোধ যত পাকিয়া উঠে, ততই সমন্বয়ের প্রয়োজন এবং অবসর উপস্থিত হয়। বাংলার বর্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই ধর্মে ও সমাজে প্রাচীনের এবং নবীনের মধ্যে বিরোধটা খুবই পাকিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরোধ পাকাইতে হয় নাই। তবে তাঁহার প্রথম জীবনে নবীন সমাজ সংস্কারের দলই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেকালে প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বয়সে কোন কোন দিক দিয়া এই দুর্বল পক্ষেরই ওকালতি গ্রহণ করিয়া প্রবল দলকে একটুকু সংযত ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু পুনরুত্থানকারী দল যখন প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্প-বিস্তর বিরোধ বাধিয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নূতন হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গেও কোন কোন দিক দিয়া তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তিনি এই দুই দলের কাহারো সঙ্গে মিলিতে পারিলেন না; কিন্তু উভয় দল হইতে পৃথক থাকিয়া ইহাদের পরস্পরের বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টাতেই "প্রচারে" তাঁহার গীতাভাষ্যের ও অনুশীলন ধর্মের আলোচনা আরম্ভ করেন।

যেমন ধর্মে ও সমাজে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সমন্বয়ের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের ও ইংরাজের মধ্যে যে

বিরোধটা অল্পে অল্পে বাধিতেছিল, পাকে প্রকারে তাহাকেই পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রচ্ছন্নভাবে এবং কখনও কখনও প্রকাশ্যেও "বঙ্গদর্শন" আমাদের এই নূতন স্বদেশপ্রীতিকে বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের উপন্যাস মুসলমান ইতিহাসের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম ও সঙ্গে সঙ্গে পরজাতি বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলে। "চন্দ্রশেখরে" এবং "আনন্দমঠে" সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরের ইংরাজ-বিদ্বেষকে প্রকাশ্য ভাবে ফুটাইয়া তুলে। এইরূপে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের ভূমি গড়িবার পূর্বে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা খুব ভাল করিয়া পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এ বিরোধটা কিন্তু পাকিয়া উঠে নাই। পাকিয়া উঠে তাঁহার স্বর্গারোহণের দশ বার বৎসর পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কোন পথে এই সাংঘাতিক বিরোধের সমন্বয়ের সম্ভাবনা আছে তাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন।

দেখিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি তাঁহার ধর্মের অঙ্গ ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরে য়ুরোপে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বান্তঃকরণে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শ সার্বজনীন। য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব যে সাম্যের সন্ধানে গিয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে ভগবান বুদ্ধদেব সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার "সাম্য" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সার্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। সময়োচিত হয় নাই বলিয়া তিনি এই প্রবন্ধটিকে পরে তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহার কথা জানেন না। কিন্তু আধুনিক সমাজতন্ত্রের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার এই মহামূল্য প্রবন্ধটি আবার প্রচারিত হইলে মন্দ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ মৈত্রীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কেরা সাম্যের আদর্শটাই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন, যদিও

তাঁহারা equality (সাম্য) এবং liberty (স্বাধীনতার) সঙ্গে fraternity (ভ্রাতৃত্ব) জুড়িয়া দিয়াছিলেন, এই সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে fraternity বা ভ্রাতৃত্বের কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কেবল নিরঙ্কুশ সাম্য ও স্বাধীনতার আস্ফালনে সমাজবন্ধন টিকিয়া থাকিতে পারে না দেখিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাধনের মৈত্রী ঠিক এই fraternity বা ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল না। সর্বভূতে আত্মদৃষ্টির উপরে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ্ কহিয়াছেন যে আপনার অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে সকল মানুষের মধ্যে দেখা, ইহাই আমাদের দেশের মৈত্রীর বনিয়াদ। য়ুরোপ এ তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই। সুতরাং য়ুরোপের সাম্যবাদ এবং স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এখনও বিরোধকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রীর, সাম্যের সঙ্গে আত্মসংযমের সমন্বয় সাধন করিতে পারে নাই। য়ুরোপে এইজন্য এই জটিল সমাজসমস্যার মীমাংসার পথ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরাও এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় সাম্য ও স্বাধীনতার সন্ধানে এই বিরোধের পথেই চলিয়াছিলাম। তারই জন্য মনে হয় কি জানি তাঁর 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সাংঘাতিক সাম্য ও স্বাধীনতার একদেশদর্শী আদর্শে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে, য়ুরোপ যে সর্বনাশের পথে ছুটিয়াছে, সেই পথেই চালাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাম্য" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গীতোক্ত কর্মযোগের পথে ভারতের আধুনিক সাধনাকে প্রবর্তিত করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা বিশ্বাত্মৈকত্বের অনুভূতির উপরে সাম্য এবং স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীর উপরেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিরোধেরও সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় ছাঁচের স্বদেশপ্রীতির আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। য়ুরোপীয়েরা নিজের দেশকে বড় করিতে যাইয়া অপরের দেশের উপর অকথ্য

অত্যাচার করিয়া থাকে, একথা তিনি দেখিয়াছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি য়ুরোপের এই স্বদেশপ্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের লোকে কোনদিন যেন এই আত্মঘাতী, বিশ্বদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী আদর্শের অনুসরণ না করে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রনীতির পথ বর্জন করিয়া চলিতে হইলে যেভাবে আধুনিক য়ুরোপে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসকল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষকে সে পথে যাইলে চলিবে না। আর যুদ্ধবিগ্রহের পথে যদি ভারতবর্ষ আপনার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে যায় বা যাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে য়ুরোপে যেরূপ সামরিক সাম্রাজ্য-সকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ভারতবর্ষেও সেই জাতীয় সামরিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হইয়া উঠিবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা যে এই মোটা কথাটা ধরিতে পারে নাই, এরূপও মনে করিতে পারি না। যুদ্ধ করিতে হইলেই সেনা ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিককালে যুদ্ধ ব্যাপারটা অতি জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বাহুবলে আজিকালি রণজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে হইলে এখন বাহুবল, ধনবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল, জাতীয় জীবনের প্রায় সমগ্র শক্তিকে ও সম্পদকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাতে যুযুৎসু জাতিসকল পুনরায় অভিনব দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, সত্য স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রতার আদর্শ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই পথে বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অসাধ্য। আর ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শই এই বিশ্বজনীন মৈত্রী। ভারতবর্ষের হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়াছে; ইহাই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্ব। এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষ আপনাকে হারাইবে। আপনাকে যদি হারাইয়া ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতনই হইয়া উঠে তবে তাহার স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিবার কোন হেতু থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল কথা যেরূপ সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছিলেন, এযুগে রামমোহন ছাড়া আর কেহ সেরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আর এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ধর্মে ও সমাজে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একটা সমন্বয় সাধন

করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহ যে পাপ এরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কখন ভাবিতেন না। নিষ্কামভাবে আততায়ীর আততায়িতা নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ পাপ হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় পুণ্য কর্ম, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা। "আনন্দমঠে", "সীতারামে", "দেবী-চৌধুরানীতে", "অনুশীলন ধর্মে" ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া এই কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন যতক্ষণ কৌরবদিগের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের সন্ধিতে বা আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ যতক্ষণ স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য বিদেশীয় প্রভুশক্তির সঙ্গে সন্ধির ও সোলেনামার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ মারাত্মক বিদ্রোহের পথ অবলম্বন অধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই সন্ধি ও সোলেনামার দিকে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা যেন নিবদ্ধ ছিল। এইজন্যই তিনি স্বদেশবাসীদিগকে আপনার বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল ও বিদ্যাবল সংগ্রহ করিবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিলেন। "কমলাকান্তের দপ্তরে" আত্মনির্ভর যে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ—ভিক্ষাবৃত্তিতে যে স্বাধীনতা মিলে না, এই কথাটা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ অন্য দিকে এই আত্মশক্তিকে বিরোধ জাগাইবার পথে পরিচালিত না করিয়া প্রজার প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যের স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আপোষে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের রাজনীতিতে সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সংগ্রাম নহে, সন্ধির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা। এইরূপেই বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই কথাটা না ধরিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতির মূল তত্ত্বটা ধরা সম্ভব হইবে না।

'নব যুগের বাংলা' হইতে গৃহীত।

কবিতা ও বিজ্ঞান

জগদীশচন্দ্র বসু

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদপ্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই একেকে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো প্রবল বাধা ঘটে না।

ফলতঃ, জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব।

কবি এই বিশ্ব-জগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া

যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেজন্য প্রতি দিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে

হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন "যেন" নহে—এই সেই।

'অব্যক্ত' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

মেঘদূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ একখণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রকালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্‌ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল। আর, সেই-যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়। আর, সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী। অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুলচরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটু-খানি আলো করিতে পারা যায়।

আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন

তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষাব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা-সিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধলোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতাবিভ্রমে পরিচিত নিবিড়পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহল-দৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি, এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে প্রবাসীরা আপন আপন পথিকবধূর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্য যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্ত্যলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘ-দূত প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে। আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে মনে জন্মমৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌছে, তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন, 'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!

কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানস-লোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!' এ কী হইল। যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন। ওখানে তো তোমার

স্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন: তেঁই বলরামের, পহু, চিত্ত নহে স্থির! যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

হে নির্জনগিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে? তোমার তো চেতন-অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান নাই, কী জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক'।

'প্রাচীন সাহিত্য' (১৩০৭)

মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।[১] অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতলার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বউঠাকুরাণী[২] তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া

---

১. মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১, বুধবার, ২৭ ফাল্গুন [ইং ১৮৭৫, ১১ মার্চ]

২. কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী।

চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর-একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ[৩] ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

---

৩. কাদম্বরী দেবী।

কিন্তু, আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর[৪] সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না

৪. কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ১২৯১, ৮ই বৈশাখ [ইং ১৮৮৪, ১৯ এপ্রিল]

তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেই ক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুলভার জীবন-মৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভারবদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ

করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোক-লৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে এক জোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের[৫] বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত, এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন, তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা; সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোট ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টরলনি মনুমেণ্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ

৫। Thacker Spink & Co.

কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল; পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণ দ্বারের উপরে আঁকপাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯)

সমাজতন্ত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব—এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণ স্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়া আরও ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী—মনে করি, যে-কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থ সাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা-কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তি সঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'। বেণ* রাজার ন্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ

---

* বেণ—ভাগবতোক্ত রাজা-বিশেষ। কথিত আছে, ইনি আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আদি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন। ঋষিগণ তাঁহার এ অহঙ্কার দূর করিবার জন্য কোন সময়ে সদুপদেশ দিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের তিরস্কার করেন এবং আপনাকেই পূজা করিতে বলায় তাঁহাদের কোপানলে নিহত হন।

আপনাকে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয় নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি-দূরে নিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ।' কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনত মস্তকে (উহা) গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, "উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু-সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে-প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার

দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ-কশাহস্ত বণিক-সকলের হৃৎকম্প-উৎপাদক।" অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্য-বর্গের ধনধান্য-সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি-সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

'বণিক কোন দেশে না যায়?' নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলা-বিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনী-যোগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্য-ভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্য প্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?

এ দেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য-তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই—আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে,

জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটু ভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে- এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে-প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্* প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একবারেই নাই।

পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই

* সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ।

বটে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষ-ভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যকজ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী* পশুকুল যে—নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ,

* পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করে যে।

স্বদেশের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

(স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক।) ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতক-গুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসন-যন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে-চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অপর প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এদেশের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ* দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাব-সংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যের ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয় ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে

---

* চিহ্ন।

নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নয়কুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা—যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

বর্তমান ভারত' হইতে সংকলিত।

সুখ না দুঃখ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯)

মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য সর্বোত-ভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে, যাহা বুঝায় বা যে যা' বুঝে তাহারই জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবনপ্রবাহ, এবং স্থূল হিসাবে সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি। এস্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপে গ্রহণ করে। একের উদ্দেশ্য—একের লক্ষ্য পদার্থ—অন্যের প্রার্থনীয় হউক আর নাই হউক, নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলে জগৎ চলিতেছে; জীবজগতে অভিব্যক্তি তাহার ফলেই ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্থূল কথায় এই।

যদিও আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, তথাপি মানবের জীবনে সুখের ভাগ অধিক কি দুঃখের ভাগ অধিক, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে, জীবনে সুখের মাত্রা নিশ্চিতই অধিক; অন্য পক্ষ বলেন দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক মাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সুস্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ আপনি জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্যশীল নহেন; তাঁহাদের রুগ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্বলতায় তাঁহাদের শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পঙ্ক হইতে উঠিয়া সুখের শুষ্ক বর্ত্মে উত্তীর্ণ

হইতে পারে না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতামত আপন আপন জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামাত্র. জগতে সুখ-দুঃখের তারতম্যনির্ণয়ে তাঁহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা ; নিকৃতির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে, তাহা ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা হইয়া যাইত। কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন স্বভাবদত্ত চশমা চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন না , কাজেই কেহ বলেন এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্ !

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই :—জীবনের সুখ অধিক, জীবনের অস্তিত্ব তাহার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন ? মানুষ যে বাঁচিতে চায়, —অবশ্য দুই চারিটা আত্মঘাতীকে বর্জন করিয়া—ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে। মানবজীবনে দুঃখের ভাগ অধিক হইলে মানবের জন্য দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত , বসুধা এতদিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আধিব্যাধি মরণ-যাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধর্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোস্-পরা অধর্মের জয়জয়কার, এসব নাই এমন নহে ; তবে স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা সরলতা প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও জগতে বর্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্বোতভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহার নিদ্রা সম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও অত্যন্ত ব্যাপৃত , নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্য-জাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাহারা ধর্মশাস্ত্রকে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে

পারেন না। কেননা, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম ও উদ্দেশ্য; দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না; অভিব্যক্তি যখন ঘটিতেছে, তখন দুঃখ আছে বৈকি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই উদ্দেশ্যের মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রদ তাহাই ধর্ম, আর যাহা দুঃখপ্রদ বা মোটের উপর দুঃখপ্রদ, তাহাই অধর্ম। ধর্মাধর্মের এইরূপ তাৎপর্য শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু 'সুখ' শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই যে নিম্ন পর্যায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখই বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন বর্ধন করে; এবং জীবনবর্ধনের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য আর কি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি ক্রমশঃ হইতেছে, ইতিহাস যদি ইহা সমর্থন করে, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে। কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক, নতুবা লোকে জীবনবর্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত; ধর্মনীতি উল্টাইয়া যাইত; দয়াদাক্ষিণ্য পাপের পর্যায়ে ও চুরি-ডাকাতি ধর্মের পর্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের লিখিত পুঁথি কয়খানা জগতের দৃশ্যপটকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্বে যেখানে শান্তি প্রীতি ও মাধুর্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা দ্বেষ শোণিততৃষ্ণা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্তরসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম! জীবজগতে বিদ্যমান এই নির্মম দ্বন্দ্ব আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির মূল একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অনেক

অভিনয় যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা অল্প। কিন্তু যাহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নবগঠিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, হর্বার্ট স্পেন্সার ইহার একজন প্রধান প্রচারক; এবং হর্বার্ট স্পেন্সার একালের অভিব্যক্তিবাদের একজন প্রধান 'পাণ্ডা'।

ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই দুঃসাহসিক ব্যাপার হয়; কেননা, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আর সুখ কি? রক্তপাত করিয়া ঘাতকের আপন মনের মত তৃপ্তি কিয়ৎ পরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র; জঠরজ্বালারূপ সনাতন মহাদুঃখ নিবারণের জন্যই জীবের এই হত্যাব্যবসায়; আহার সম্পাদনের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান তাহার পরোপকারবৃত্তি যে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং তজ্জন্য সে পরার্থ জীবনদান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ডারুইন-তত্ত্বের অন্যতর প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস্ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস্ এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, কিন্তু হিংসা আছে, ক্লেশ নাই। হত্যাকর্ম্মের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কর্মটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় না। দয়াশীলা প্রকৃতির এমনই সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না; এমন কি, তাহার বোধশক্তি হননকালে লোপ পায়, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। প্রহারের দর্শন শ্রবণ বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে তেমন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন কিনা সন্দেহ। তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহারভোগে যেন ক্লেশ খুব অল্প হইল, বা না হইল, তবে প্রহার-দর্শনও ত নিত্য ঘটনা। এবং প্রহারদর্শনে যদিও দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবারণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার

দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ। আবার দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি। কাজেই দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্তমান জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাসও যে স্বপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ওপক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই, খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; পক্ষান্তরে দুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; ধনী কয়টা? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়? আবার অধর্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম অধিক না অধর্ম অধিক? ধার্মিক যেখানে দুইটা, অধার্মিক সেখানে দু'শটা; আবার ধার্মিক দুইটার ধার্মিকত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ; অধার্মিক দু'শটার অধার্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত, কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়! অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্ডশ্রমমাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। কামনা বা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জীবনের সমুদায় কার্য; বুদ্ধি কি চিন্তা কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত কামনারই ভরণপোষণ ও পরিচর্যা কার্যে নিযুক্ত। সেই কামনার অর্থ কি? না, বর্তমান অভাবের, বর্তমান ক্লেশের, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে 'দুঃখময়তা' হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবন দুঃখময় কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবনলীলা। বাঁচিবার

ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা ; তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায়? ধর, সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই ; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে ; দুঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায় ; দুঃখকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষা, পরিতাপ সবই দুঃখময় ; যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাবমাত্র ; ধন মান প্রণয় সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ ; স্নেহ মায়া মমতা, ইহারাও অধিকাংশ দুঃখেরই মূল ; জ্ঞান, ধর্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়।" যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক ; তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ পাথরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর ; নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায় ; বিদেশী কাবাবাসীর জন্য হাইয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে ; কার দুঃখ অধিক?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না ; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে ; ফাঁদ এড়াইতে গিয়া ফাঁদে পা দিতেছে ;

দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে ; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না ; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য বুদ্ধিমান যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

একালের দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী সুখের আশা নাই ; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে ; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর ; কামনা নিরোধ কর ; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যে সমাহিত হউক। স্ফূর্তিমান্ ইংরেজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায় ; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্মানিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, ফল দাও, পশু দাও, প্রজা দাও বলিয়া যাঁহারা যাগাগ্নিতে হব্যধারা ঢালিতেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তির ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ পন্থায় তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন। তারপর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে ; মুক্তি লাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে ; যিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা ; কামনা নিরোধ কর, কর্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতিবিম্বমাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন,

তাহা বোধ হয় না; ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে "প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্‌" বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া কেবল সৌন্দর্যদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী হইও না; ইহাই রামায়ণের উপদেশ। শেক্সপীয়রের মনঃকল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত প্রফুল্ল স্ফূর্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই শেক্সপীয়র জীবনের রহস্য ভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রীতির নৈরাশ্য, ধর্মের অবমাননা ও জীবনের নিষ্ফলতার উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধু-শোকার্ত টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃত দেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও-বা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় জীবনের বৃদ্ধি তাহার উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন তাহার খেয়াল হইবে নিষ্ঠুরভাবে তখনই তোমায় বলিদান দিবে; তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই-বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান জীবের জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায় না।

মোট কথা পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।

জিজ্ঞাসা' (১৯০৪)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ইংরেজী হিসাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরেজীতে লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে বলা চলে যে, তিনি ইংরেজী ভাষায় একজন পাকা মুন্সী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজ সাজেন নাই, ইংরেজী ভাষার ও সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হন নাই। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। খাঁটি বাঙ্গালীর গৌড়ীয় ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষায় ইংরেজী শব্দের বা স্ফুটোক্তির অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি ইংরেজী ভাবকে খাঁটি বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত 'কল্পতরু', 'ক্ষুদীরাম' ও 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্যে ঝরঝরে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ' নির্ভেজাল গৌড়ীয় গদ্যে-পদ্যে লিখিত হইত। 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে-সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন। এই হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ ছিলেন।

খাঁটি বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইংরেজীয়ানায় পরিবৃত থাকিলেও শেষ জীবনে আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ-পরিচ্ছদে প্রায় ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরেজীনবীস্ কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব। ইংরেজীতে যাহাকে satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব ও অতুলনীয় satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় একদিকে যেমন ইংরেজী wit ও humour দেখান আছে, অন্য দিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালায় সাহিত্য-সমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামর্থ্য যে আমাদের অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও ইন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই তাঁহার সরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুরাগী হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"আমি satireটাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satirist দিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু De-Quincey-এর মোলায়েম রসিকতা বাঙ্গালার গাছমরীচ মিশাইয়া, কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিমবাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল humourist বটে; পরন্তু বেজায় emotional; নির্বের হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কশাঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে, তখন তাহার এই অপূর্ব humour এবং নির্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই শুষ্ক হইয়া

যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানির মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।"

ইন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গালায় কদাচিৎ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্ঘের কেন্দ্র-মূর্ত্তি ছিলেন; হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনস্বী সকল উঁহার সদস্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের Halley's comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উঁহার প্রভায় দশ দিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উঁহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন্ অন্ধকার কোণটি উঁহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশ শুদ্ধ লোক তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে।" ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-সামর্থ্যের এমন পরিচয়-পত্র আমি আর দেখি নাই। ইন্দ্রনাথের মনীষার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি কথায় যেরূপ ফুটাইয়াছিলেন, তেমনভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে না।

Satirist-এর অবলম্বন bonhomie ইন্দ্রনাথের খুবই ছিল। একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে ইন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন "ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠতে পারি নে।" উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"যখন অনুমতি পাইলাম, তখন করিব।" কিছুদিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বাহির হইল, 'বোধোদয়ে'র ব্যঙ্গ বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে ইন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্ন স্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার হাসির হলহলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদনধ্বনি শুন

যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাঁহার 'ক্ষুদীরাম' পুস্তিকায় এই শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। 'ক্ষুদীরাম' যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে; অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাসকৌশল এমনই অসামান্য যে, এক-এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এবংবিধ হাস্যের কার্পাস-আবরণে শোকের অশ্রুধারা তাঁহার 'ভারত-উদ্ধারে' ও 'কল্পতরু'তে আছে; পঞ্চানন্দের বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষে পাওয়া যায়। লেখকের আরাধ্য আদর্শের পরিচয় পাইলে হাসির মধ্যে কান্নার অংশটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ পুরাতন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। অপূর্ব ভাষায় তিনি সেই আদর্শ হইতে চ্যুতিজন্য সামাজিক উদ্ভটতা সকলের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থানে তিনি নিজেই সামলাইতে পারেন নাই, তাই পর্বত-পঞ্জর ভেদ করিয়া গিরিতটিনী যেমন বিমল অশ্রুকণার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে হৃদ্‌গত শোকাশ্রুর দুই-এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই হিসাবে তাঁহাকে হেল্‌ভেশিয়সের (Helvetius) ভাষায় Patriot satirist বলা চলে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত : 'পাঁচকড়ি রচনাবলী'

সৌন্দর্যের সন্ধান

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হ'ল মনে না ধরার ঝগড়া। ইমারতে ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে সহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান, অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখী প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এইসব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধূলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলে সুরে ছন্দে ভরে' তুলছে সহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এই সব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে' খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধূলো মাটি, তাই তো খেলছে ওরা ধূলোকে নিয়ে ধূলোখেলা! রথের দিনে মথোসামগ্রী—সোলার ফুল পাতার বাঁশি—তার সুর আর রং আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে-বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙ্গা কাচের মতো এক খণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপ্‌সা প্রাচীরে ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোর-কাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর, সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোর-কাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয় তো দোপাটি ফুলের রংএর ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম রকম, আর থেকে থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়ারিদের আকাশ বাতাস আড়াল করা চৌতলা পাঁচতলা বাড়ীগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে' চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়ারি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তাদের নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ী আর ভাঙাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও

আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কা॰ কাছ থেকে ধার করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাবো তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্মে নানা মুনি নানা মতো আরসী আমাদের জন্মে সৃজন করে গেছেন, সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হতো তো মানুষ কোন্ কালে এইসব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতসী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পরে' বসে' থাকতো, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলতো না; কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না। তাই সেখানে অন্তের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাজকে দেখছে সুন্দর, সে দিন-রাত কাজের ধান্দায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর সে সেইদিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কাজ অথবা সুন্দর রকমের অকাজ! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্বস্ব আগ্‌লাবার সুন্দর চাবি-কাটি, বিশ্রী তালা-চাবি কেউ খোঁজে না—আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়ী জুড়ি বি-এ পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরী এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ী যেখানে সব জিনিষ সুন্দর করে' উপভোগ করা যায়। হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্মে এবং ছবি-লিখিয়ের হা হুতাশ হচ্ছে কলা-লক্ষ্মীর জন্মে, ধরতে গেলে সব হা-হুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এই জন্মে, অসুন্দরের জন্মে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যে ভাবেই হোক যা কিছু বা যারই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর

দিক, আর একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক আমাদের জনে জনে মনেরও ঐ রকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি। কাজেই দেখি, যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে ভিতরে মিললো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে স্বরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপক-সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন সমালোচকের সৌন্দর্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে' এই দুই মূর্তির বিচার করবো? আ-কা-শ এই তিনটে অক্ষরে আকাশ জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভাল, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে 'নব-নীরদ-শ্যাম' যা দেখে চোখ ভুললো মন ঘুরলো, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়লো সেই সুন্দর। সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের নিজের মন। পণ্ডিতের কাজই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে' তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে' স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্তিকেই সৌন্দর্য-সৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ্ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বললে—সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভাল, ঠিক সেই সময় গ্রীস বললে—না, মানুষকে করে' তোল সুন্দর দেবতার প্রায় কিম্বা দেবতাকে করে' তোল প্রায় মানুষ! আবার চীন বল্লে—খবরদার, দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে। নিগ্রোদের আর্ট, যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রং-রেখার খেলা!

এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে' বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হ'তো তবে এতদিনে সৌন্দর্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পরম-সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে' যেতো তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বললে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে-জনে মনে-মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি। তাঁর সৃষ্টি, এটি সুন্দর অসুন্দর দুই-ই, এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণও নয়, পরিপূর্ণও নয়, এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে' যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে-অশান্তিতে সুখে-দুঃখে সুন্দরে-অসুন্দরে মিলিয়ে হল' ছোট এই নীড়, তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশির-বিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চললো। এই হ'ল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্ব রচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে' কোন কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষরূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্য দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো, মিটলো না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোন দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে' ওঠার, নদীর ভরে' ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে' ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচ্‌নী থেকে আরম্ভ করে' পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়, তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস ভারত চীন ঈজিপ্ট সবাই দেখি

পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি, কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে। আজ যেখানে মনে হল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয়নি, আরো এগোতে হবে কিম্বা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে। পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌছচ্ছে, আর্ট, এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠলো ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, চল, আরো বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চির-যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন-নতুন।

'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী':
ব্রাঃ বিশ্বঃ সং

ভগিনী নিবেদিতা

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)

১৯০৭ সনে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) রিডার হইয়া আমি ইংরাজীতে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা করিয়া আমি দুইজনকে দেখাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসুর নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিস্ মারগ্রেট নোব্লের নাম—ইনি 'নিবেদিতা' নামেই বঙ্গসমাজে পরিচিত। আমাদের কলিকাতার বাড়ীর পার্শ্বেই বোসপাড়া লেনে (এখন 'নিবেদিতা লেন') ইনি একটি ছোট-খাটো দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে দেখাইবার প্রস্তাব করি। তিনি তখনই স্বীকার করিলেন। আমি বলিলাম, "পুস্তকখানি খুব বড়।" "তা হউক না, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।" এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন।

নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন—রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন "দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার সঙ্গে ও-সম্বন্ধে কথা বলিব না।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজী ইডিয়ম-সংক্রান্ত ভুল মাঝে মাঝে না পাইতেন এমন নহে, কিন্তু তিনি মোটের উপর বলিতেন, "আপনার ইংরাজী ভাল।" ভাবের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার সর্বদা তর্কবিতর্ক ও বিরোধ চলিত;

সে সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি কোনমতেই প্রতিকূল হইলে আমার মত মানিয়া লইতেন না। হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কথা, অথচ তাঁহারই কথা আমাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই দায়ে পড়িলাম। ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা ছাগল রাখিতে বনে প্রেরিত হইয়াছিল—এই অপরাধে জ্ঞাতিগণ তাঁহার হাতে খাইবেন না বলিয়া ঘোঁট করিয়া বসিলেন—"এক, হয় অগ্নি কিংবা বিষ-পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরিত্রের শুদ্ধতা সর্বসমক্ষে প্রমাণ কর, নতুবা এক লক্ষ টাকা খেসারত দিয়া তাহাকে ঘরে রাখ,—অন্যথা আমরা তোমাকে সমাজচ্যুত করিব।" আমি ধনপতির গল্প লিখিতেছিলাম, সুতরাং এসকল কথা বাদ দেই কি করিয়া? কিন্তু নিবেদিতা জেদ করিয়া বসিলেন, "বাদ দিতেই হবে।" স্ত্রীলোকের জেদ—সে যে কী ভীষণ, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তাঁহার যুক্তি এই—"জোর ক'রে তার সতিনী তাকে ছাগল রাখিতে বনে পাঠিয়ে দিয়ে তার উপর জুলুম করলে, তাকে ঢেঁকিশালে শুতে দিলে, আধপেটা খাইয়ে চূড়ান্ত কষ্ট দিলে। সামাজিক বিচারপতিগণ এজন্য লহনার কোন শাস্তি না দিয়ে, নিপীড়িত নিরপরাধ খুল্লনার উপর উল্টো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, এ কেমন সমাজ? আপনার গল্পে যদি একথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক এটাকে 'কাজির বিচার' ব'লে আপনাদের ঠাট্টা করবে—'নো নো নো—একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প হতে এটি ছেঁটে ফেলুন।" আমি বলিলাম—"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র-মর্যাদার আদর্শ অন্যরূপ—সে মাপকাঠি বাতাসে নড়ে, তা আপনাদের common sense দিয়া বুঝিতে পারবেন না। ধরুন, যদি বীণাটির তারে সুর দিয়া বাদক বাঁধিয়া দেন, আর যদি একটা হাওয়ায় নড়িয়া গিয়া কোনো তারটা একটু শিথিল হয়—তাহাও সেই বাদক সহ্য করিতে পারেন না—যাবৎ তাঁর কানে একটুকুও বাধিবে—সে পর্যন্ত তিনি রাগরাগিণী বাজাইবেন না। আমাদের সামাজিক বিধানে স্ত্রীলোক দেবীর ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন—সেই দেবতা সর্বপ্রকার কলঙ্ক ও গ্লানির উপরে থাকিবেন—কোনও প্রতিকূল মন্তব্য লেশমাত্র হইলে তাহার স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়গণ লজ্জায় মরিয়া যাইতেন. এইজন্য রাম

সীতাকে নিরপরাধ জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না,—কৌস্তভমণিতে যদি একটা সূতার তুল্য দাগ লাগে তবে মণিরাজের মূল্য কমিয়া যায়। স্ত্রীলোককে এতটা সখের পোষাকী জিনিষের মত করিয়া রাখা ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক, এমন কি ন্যায়সঙ্গত কিনা—তাহা আমি জানি না। স্ত্রীলোক যে জহর-ব্রত করিয়া—সতী সাজিয়া—আগুনে পুড়িয়া মরিত, তাহাও এই আদর্শ পবিত্রতা রক্ষার জন্য—'সিজারের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথাটি হইতে পারিবে না',—এই প্রবাদের অনুকূলে আমাদের সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি। ন্যায়-অন্যায়ের সীমা অনেকটা নীচেকার কথা। একজাতি যদি কোন একটা জিনিষকে খুব বড় করিয়া দেখে,—এতবড় করিয়া দেখে যে, পার্থিব ব্যবহারিক নীতি ততদূর পৌছায় না, ঐন্দ্রজালিক রূপ দিয়া দেখে, যাহা ফুঁয়ের ভর সহ্য করে না,—ভাবের রাজ্যে সে একটা মস্ত বড় বাহাদুরী। আপনাদের সমাজ কাটখোট্টা, জীবনযাত্রা চালাইবার পক্ষে সুবিধাজনক ও মোটামুটি ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু এদেশের কাব্য, জীবন ও সমাজ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবমূলক। সেই ভাবের যাদুকাঠি হাতে না থাকিলে এই সমাজের মন্দিরে আরতি দেখিবার প্রবেশাধিকার হইবে না।"

এই ভাবে কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়ত পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, দুইদিন তর্কযুদ্ধে কাটিয়া যাইত। নিবেদিতা নিজের জেদ বজায় রাখিতে সময়ে সময়ে এতটা বদ্ধপরিকর হইতেন যে, বলিয়া বসিতেন—"দীনেশবাবু ঠিক বলছি, যদি এই অংশটা পরিবর্তন না করেন, তবে আমি এ পুস্তক আর পড়ব না।" আমি প্রমাদ গণিতাম ও তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা পরিবর্তন করিতাম। নিজের ভাবের সঙ্গে না মিলিলে তিনি থামিয়া যাইতেন, কিছুতেই আগাইতে চাহিতেন না, ঠিক হাতী পাঁকে পড়িলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কোন একটা অংশে আসিয়া থামিয়া পড়িতেন। এটা ভুলিয়া যাইতেন যে, পুস্তকের মতামতের দায়িত্ব আমার, ইংরাজী সংশোধনের ভার তাঁহাকে দিয়াছি। সেখানে তাঁহার স্ত্রী-জনোচিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটা সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোনদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র। এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে—একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণরূপে পাইয়াছিলাম।

কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্যপুরাণের শিব সম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে—'শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোনদিন কিছু জোটে, আর কোনদিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তাহা হইলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে।" এই ভাব-সম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপূর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো আমার মনেই হয় নাই। কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। কেবল 'আশ্চর্য, আশ্চর্য' এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিষ পেয়েছেন, যে দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন?" নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ও দীনেশবাবু, এটা একটা আশ্চর্য জিনিস।" আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় যেন কি হইয়াছে। সেই সময় সেখানে আর একজন মেমসাহেব ছিলেন, আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য কি পাইয়াছেন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কী শুনিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "শুনেছি, সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন 'ঠাকুর, আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন'—তাঁহারা কত কি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ কবিতার ভক্ত তাঁহার উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই, ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে ঠাকুরের কষ্ট যাহাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁহার ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।"

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। গ্রাম্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধায় কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন, "বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও কারুণ্য আছে,—তাদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোনা-রূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।"

নিবেদিতা আমার পুস্তকে বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা পড়িয়া প্রায়ই আমাকে তাগাদা করিতেন, একজন বৈষ্ণব কীর্তনিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতে। আমি আগমনী-গায়ক একজন বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইয়াছিলাম। "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল" গান শুনিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গায়ককে একটি টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

নিবেদিতা আমার পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে যখন খুসি হইতেন, তখন মাঝে মাঝে বলিতেন, "দীনেশবাবু আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন

আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্মপীড়া দান করে, কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভাল লাগে,. কেন শুনিবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খাটিয়াছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করিবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগে।" তিনি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিতেন। একদিন আমি সত্যই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাকাল, গণেন, আমি ও নিবেদিতা বাগবাজারের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমি ছিলাম আগে, তারপর নিবেদিতা এবং সর্বশেষে গণেন। এমন সময় একটা ষাঁড় ক্ষেপিয়া শিং নাড়িতে নাড়িতে আমার সামনে ছুটিয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে পাশ কাটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম, কিন্তু আমি সরিয়া পড়াতে যে নিবেদিতাকে ষাঁড়ের শিং-এর সম্মুখীন করিয়া গেলাম, তা ভাবিয়া দেখিবার অবসর আমার হয় নাই। গণেন তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ষাঁড়টাকে তাড়াইয়া দিলেন; তারপর তিনজনে আবার একত্র হইলাম। তখন নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি পুরুষ জাতির আজ মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একটি নিঃসহায় রমণীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছেন। অদ্যকার এই কাজটি আপনার একটা কীর্তিস্তম্ভের মত হয়ে রইল।" তারপর হাসির ছটা মুখ হইতে চলিয়া গেল, এবং একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিলেন, "দীনেশবাবু, আপনার একটু লজ্জা হ'ল না?" আমি কাজটা ভাল করি নাই, সেইজন্য অন্য সময় যেরূপ কথা কাটাকাটি করি, তা না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি রাস্তায় যাইতে সাহেবদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু বাঙালীদিগকে খুব সম্মান দেখাইতেন। একদিন তিনি আর আমি ট্রামে যাইতেছিলাম, এমন সময় একজন ইংরেজ আসিয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিলেন, তিনি এমন তীব্রভাবে চোখ রাঙ্গাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন যে, সাহেব অধোমুখে অন্য বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। নিবেদিতা আমার কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প

করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নিকট নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন ; ভারতবাসীদের সকলকে ভাই বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এইজন্য 'ভগিনী নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এইটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

যেদিন আমার নিকট তিনি শুনিলেন, খড়দহে একদা ২২০০ নেড়া ও ১০০০ নেড়ী বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে খড়দহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। এই নেড়া-নেড়ীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। বৌদ্ধ ধর্মের জয়পতাকা যখন বঙ্গদেশে হতশ্রী ও লাঞ্ছিত হয় এবং উক্ত ধর্মের পাণ্ডাগণ যখন এতদ্দেশ হইতে পলায়নপর হন, তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দুর্দশা ও অধঃপাতের চূড়ান্ত সীমায় নীত হইয়াছিল। বিজয়দৃপ্ত হিন্দুসমাজ ইহাদের প্রতিকূলে একেবারে দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলেন। এই পতিতের দলটিকে বীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দান করেন। যে-স্থানটিতে তাহারা শরণপ্রার্থী হয় এবং যে-স্থানে দয়াল বৈষ্ণব-প্রভু শরণাগতদিগকে আশ্রয় দান করেন—সেই স্থানটিতে নেড়ানেড়ীদের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিস্বরূপ প্রায় ৩৫০ বৎসর যাবৎ একটা বাৎসরিক মেলা বসিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ এই মেলাটি উঠিয়া গিয়াছে।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি ও গণেন কথানি নৌকায় খড়দহে রওনা হইলাম। আমরা এইরূপ নৌকায় আরও দুই-তিনবার পরিভ্রমণ করিয়াছি। খাওয়া দাওয়া ১০টার মধ্যে সমাধা করিয়া সন্ধ্যায় বাগবাজারে ফিরিয়াছি। খড়দহে যাওয়ার দিন তাঁহার কি আনন্দ! বেলা তিনটার সময় খড়দহের ঘাটে পৌঁছিলাম। একজন মেম সাহেব, ও সঙ্গে দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ঘাটে নৌকা লাগাইতে দেখিয়া কর্মহীন পল্লীর লোকেরা কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছিলেন। ফীতোদর লম্বিতোপবীত গোঁসাইর দল ঘাটে আসিয়া আমাদের দিকে সকৌতুকে দৃষ্টি-

পাত করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে পরিচয় দিতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন। দর্শকেরা ভাবিয়াছিলেন, আমরা নৌকা কয়েক মিনিট সেই ঘাটে রাখিয়া পুনরায় চলিয়া যাইব। কিন্তু সত্য সত্যই যখন নিবেদিতা তীরে পদার্পণ করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলিতে বলিতে আমরা গাঁয়ের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন পঙ্গপালের মত নিত্যানন্দবংশীয়গণ ও অপরাপর লোকে আমাদের পিছনে পিছনে চলিলেন। এই অপূর্ব শোভা যাত্রা দেখিয়া নিবেদিতা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনুসরণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ কাসিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেহ লম্বোদরটি হেলাইয়া বক্র দৃষ্টিদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন, কেহ গামছাখানি দিয়া মুখ মুছিয়া যৎপরোনাস্তি সাহসের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ইনি কে?" সেই প্রশ্নের উত্তর শুনাইয়া যেন তাঁহাদের জীবন মরণের সমস্যার সমাধান আমি করিব, এইভাবে সেই বৃহৎ জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "উনি কে— উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি নিজের পরিচয় অপর হইতে নিজেই ভাল দিতে পারিবেন।" নিবেদিতা আমার উত্তর শুনিয়া এমনই গম্ভীর হইয়া গেলেন যে, কার সাধ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইবে? একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "শ্যামসুন্দরের মন্দির কোথায়?" অমনই দশ বার জন লোক কৃতার্থ হইয়া এক সঙ্গে উত্তর দিতে লাগিলেন। কেহ হস্ত-প্রসারণ-পূর্বক অঙ্গুলি দিয়া একেবারে উত্তরটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন, কেহ বা 'আসুন আমাদের সঙ্গে' বলিয়া আমাদের পরিচালকত্বের সমস্ত গৌরবটা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্যামসুন্দরের মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সোপানাবলীর উপর হ্যাটটি খুলিয়া রাখিয়া নিবেদিতা প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃহৎ জনতা মুগ্ধ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আমি এবং গণেন আমাদের বক্ষে সূত্রাকারে লম্বিত হিন্দুধর্মের গৌরবের শুভ্র-মহিমা প্রকট করিয়া একেবারে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে তিনি এত আপ্যায়িত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুরোধে নিত্যানন্দ প্রভুর

হস্তলিখিত ভাগবত ও তাঁহার ভগ্ন যষ্টি আনিয়া দেখাইলেন, আমরা তাহা লইয়া আসিয়া নিবেদিতাকে সেই মন্দিরের বাহিরে দেখাইলাম। পুঁথি ও লাঠির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তিনি পাঁচটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া একটি 'শিরোপা' আনিয়া নিবেদিতাকে মাথায় ধারণ করিতে বলিলেন। তখন হ্যাটটি হাতে লইয়া ভগিনী নিজের শিথিল কবরী ও সিঁথির মূল পর্যন্ত জড়াইয়া রক্ত বস্ত্রটি ধারণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই শিরোপা (রক্ত বস্ত্র খণ্ড) অতি মূল্যবান পদার্থ। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এই শিরোপা মাথায় পরিতে পারিলে এককালে রাজারাও ধন্য হইতেন, আমরা আপনাকে কম গৌরব দিলাম মনে করিবেন না, এটা একটা মস্ত বড় গৌরব। তবে আপনি কে এইবার পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।" তাঁহার ইঙ্গিতে আমি ও গণেন বলিলাম "ইঁহার অপর পরিচয়ে আপনারা কি চিনিবেন? ইনি জনৈক ইংরাজ মহিলা, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণের মঠে আশ্রয় লইয়াছেন।" একজন বলিলেন "তবে কি ইনি নিবেদিতা?" তখন আর গোপন করা চলে না। হিন্দুর দলের কাহারও কাহারও চোখে জল আসিল, কেহ বা ভক্তিতে গদ্‌গদ কণ্ঠ হইলেন, কেহ-বা দুই হাত জোড় করিয়া নিবেদিতাকে নমস্কার করিলেন। নিবেদিতা সবিনয়ে বিদায় চাহিলে পুরোহিত বলিলেন—"সেও কি হয়? প্রসাদ পাইয়া যাইতে হইবে।" খানিক পরে রসগোল্লার এক বিরাট ঠোঙা উপস্থিত হইল। তাহার নীচু হইতে অজস্র রস বাহকের গায়ে পড়িয়া তাহাকে রসিক করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দুইজনে বেশ উদর পূর্তি করিয়া খাইলাম। ভগিনী একটি খাইয়া অব্যাহতি পাইলেন না, নানারূপ মিশ্রকণ্ঠের অনুরোধ সমবায়ে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আর একটি খাইতে হইল। বেলা শেষে আমরা নেড়ানেড়ীর মেলার জায়গাটা দেখিলাম—নিবেদিতা সেইখানে বসিয়া অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মেলা সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ ছিল, এই বৌদ্ধধর্মের সমাধিক্ষেত্র দর্শন সম্বন্ধে আমি একটি

সন্দর্ভ লিখিব, তখন তিনি সেই নোটগুলি আমায় ব্যবহার করিতে দিবেন আজ বহু বৎসর পরে সেই সন্দর্ভ লিখিলাম, কিন্তু সে নোটগুলি আর পাওয়ার কোন সুযোগ হইল না।

সন্ধ্যাকালে আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরিওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া নিবেদিতা তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রয় হয়, হলদে আর কালো রঙে রঞ্জিত, স্ত্রীমূর্তির মাথায় একটা খোঁপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্ধসমাপ্ত দুইখানি হাত, সেই হস্তদ্বয় হইতে স্তনদ্বয় বড়, পায়ের জায়গাটা মৃত্তিকায় গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শতশত অলিতে গলিতে পাওয়া যায় বঙ্গের এমন বালকবালিকা বোধহয় নাই, যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙ্গিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া "Oh most wonderful" (অতীব আশ্চর্য) ক্রমাগত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "একেবারে ক্ষেপে গেলেন নাকি? এগুলির ভিতরে কি পেয়েছেন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন করছেন? এখুনি আবার খড়দহের মত এখানে ভিড় জমাবেন, দেখছি।" নিবেদিতা আমার কথায় দৃকপাত না করিয়া কেবল "অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর" এইরূপ মন্তব্য উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি পুতুল কিনিয়া রামলালের হাতে দিলেন। তারপর আমি বিদায় লইলাম।

পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করেছিলেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আপনি ও বুঝবেন না; ওর মত সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।" এই বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে বাড়াইবেন তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু তিনদিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন—"দীনেশবাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিষ সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।"

এই সময় অর্থাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দারজিলিং যাইবেন, তাহার দুই মাস পূর্বে, তিনি আমার নিকট হইতে একটি প্রস্তরময় "প্রজ্ঞাপারমিতা"র বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন—আমি বলিয়াছিলাম, "এ মূর্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন ইহাই আমার ইচ্ছা।" তিনি বলিলেন "আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।" একরূপ জোর করিয়া সেই মূর্তি লইয়া গিয়া তাহার পশ্চাৎভাগ একটা কুলঙ্গীর সঙ্গে তিনি গাঁথিয়া ফেলিয়া অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া প্রত্যহ তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীতকণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, "এ মূর্তি আপনি এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন। যেদিন হইতে এই মূর্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেইদিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিব? মৃত্যু আসিয়া তাহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।" ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমি বিগ্রহখানি অন্যত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

দারজিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমার ইংরাজীতে লিখিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল। আমি তাহার দুইখানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য আমাকে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন—পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব!

তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধ হয় আপনাকে ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না। আপনি যদি পূর্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্টবোধ করিব।" বস্তুতঃ তাহার ভগিনীজনোচিত আদব আমার নিকট কত মূল্যবান্ ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব। যে দিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোস পাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ('জিজ্ঞাসা' সংস্করণ).

বর্ষার কথা

প্রমথ চৌধুরী

আমি যদি কবি হতুম, তা হলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ, কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট-জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। হ্যামলেট, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার জো নেই। কিন্তু সংগীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এ দেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগরাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু মাস দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছয় তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাই-ই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে,

এক ভরসা ছাড়া বরষা আর-কোনো শব্দের সঙ্গে মেলে না বাংলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া, বাস্তবজীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর-এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মতো দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তা হলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্ত্য-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সততসঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনো-রূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী, শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শব্দের বন্যায় বাংলার সকল ছাঁদ বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ পরশ সরস হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলানো যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে আছেন। আমি যদি ঐ সকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তা হলে আমার চুরিবিদ্যা ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্যবৃত্তি কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্য কবিদের মতে মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃকসম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ওসব কথার আর কিছু পেটেন্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোরদায়ে ধরা পড়ব— বিশেষতঃ যখন তাদের কোনো বদলি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার জো নেই; সে যার-তার কবিতায়

নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্য কবিদের আর একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন তা হলে পরবর্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুণ সে সুযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্যজগতের এমন কোনো নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই ?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা-কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন, বাকি যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসনভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই, তা হলেও বড়ো সুবিধে করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেইসব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখি-ছুট্। বর্ষার কোকিল মৌন, কেননা দদুর বক্তা; চকোর আকাশদেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে ফটিক জল শব্দ আর মুখেও আনে না। যে সকল চরণ ও ও চঞ্চুসার পাখি, যথা বক হাঁস সারস হাড়গিলে ইত্যাদি, এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, তারা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্যন্ত নয়। তার পর কাব্যের উপযোগী ফুল ফল লতা পাতা গাছ বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা

পড়ে না, তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্বতায় পুষ্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্ধবিকশিত ও অর্ধনিমীলিত। রূপের যে অর্ধপ্রকাশ ও অর্ধগোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায় অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা, আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্ত-রূপ নেই, অপরের গুপ্ত গন্ধ নেই, অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়, অস্ত্র; গোলা এবং সঙিনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্বে যা দেখানো গেল, সে সব তো অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশি, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা, সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণ পবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়পর্বত, তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়; সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো, সূর্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা তো সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্যবংশীয় নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং ভবলীলা সংবরণ করে আমরা হয় সূর্যলোকে নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে, মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনো ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত এতই অশিষ্ট এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে সে-যে কোনো অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল এতই চঞ্চল এতই বক্র এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত

মহাকাশে সে কখনোই জন্মলাভ করে নি। আর এক কথা, বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ-ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়, অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয় আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মতো, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে দেশের হৃদয়মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে শব-সাধকের শবের ন্যায় প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তার পর তার নিঃশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এসকল জীবনের লক্ষণ, শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুংকার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা? পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা। ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপড়ান; আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন; আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সংকুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, ইনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এ স্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তা

হলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, সে-কালের বর্ষা আর এ-কালের বর্ষা এক জিনিষ নয়; নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনো মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ শান্ত-দান্ত; সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনীপ্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ, স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুংকার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ, সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়, কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সংগীতজ্ঞ, তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশী-বাদন করেন তখন সে মৃদঙ্গের সংগত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব; সে রথ অলকার প্রাসাদের মতো ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবণিতাসনাথ মুরজধ্বনিতে মুখরিত; সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তা হলে সে বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল, সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত।

'প্রবন্ধসংগ্রহ' (বিশ্বভারতী' সং, ১৯৬৮)

জীবনযাত্রা

রাজশেখর বসু

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এককালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়াতে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করে জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস একটা পিপার মধ্যে রাত্রিযাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত। এই রিক্ত জীবনযাত্রায় তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয়নি। বাংলায় 'উঞ্ছ' শব্দ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে আছে—এক উঞ্ছব্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈয়ায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোনও অনুপপত্তি (অভাব) নেই।

যাঁরা নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসী এবং যাঁদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাঁদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্য সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়

চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই দুই-এর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অনুসরণের জন্য যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessaries of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উঞ্ছব্রত এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকেই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎচিন্তা সর্ব দেশে সর্ব কালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অনুসরণ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হ'ক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি। দেশভেদে শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার অশ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্বসাধারণের জন্য জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অঙ্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের

আধুনিক নাম বুর্জোয়া) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত ষাট সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবন যাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর-বিহারের একটা মাঝারি শহরে ছিলাম। বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রার আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন তাঁর অন্নবস্ত্র আর বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তপোশ আর গোটাকতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হ'ত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নূতন উঠেছে, গুটিকতক বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্থরা প্রায় সকলেই তামাক খেত। সুগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউণ্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না. যারা-ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেট-ঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমোদের ব্যবস্থা—কালী-পুজোর সময় শখের থিয়েটার, কালে ভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা আজকাল কলকাতায় বা অন্য শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুর্মূল্য হয়েছে এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার

মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পাঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যাণ্ট আর নানারকম শৌখিন জামা চাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রসাধন দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে কয়েকবার চা চাই। সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের হালচাল জানবার জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালের মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় খেলেন অমনি তাঁর মনে হ'ল যে এতদিন বৃথাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মন্ত্রবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়ী ভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানারকম আধুনিক সুবিধা ও আরাম ভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফটি ক্ষুর, কামাবার

সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয় তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার; ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ; নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্লোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটফট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্ত টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছুকালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে, অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে, অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলিকপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্ত অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্তই যে নূতন নূতন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্তও হয়েছে। খাদ্যশস্যের অভাবের জন্ত সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে, অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু উচ্চসমাজের পার্টিতে বা আড্ডায় স্ত্রী-পুরুষের অল্লাধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বল নাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্ত লড়েছিল তখন বিদেশী জিনিষ ব্যবহারে যে সংকোচ এবং

বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যথোচিত (অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।...

আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মানুষি বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রিফ্রিজারেটার, বিজলী-উনন, ধুলো-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানারকম পোশাক, মুখ ঠোঁট আর নখের রং, নাচ ঘর, নাইট ক্লাব ইত্যাদি। জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে কৃপাবশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্পবেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগ করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইওরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনীদরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা

রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশঃ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে। এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজার মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশে ভদ্রসন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটারি রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ সুবিধা নেই, ইতর ভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহ যবনিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে দরিদ্র সোভিএট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—Want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর ; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তাহলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শাস্ত্র কথা উলটো বলে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই

বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না, পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ মোটর গাড়ি আছে, প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এতমাত্রা তড়িৎ, এত পাউণ্ড মাখন, এত পাউণ্ড সাবান এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক সুবিধা এখন স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুষ্টচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রতারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করেছেন যার সুফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্প বয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে; তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। তার জন্য এমন শিক্ষক চাই যাঁর যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি আচার ও বিনয় (discipline) শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সদভ্যাস ও

সৎকর্মের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আব্দার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মত দূরদৃষ্টি সরকার বা জনসাধারণের হয়নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।

বিচিন্তা

অতি-পুরাতন কথা

মোহিতলাল মজুমদার

নিষ্পাপ শিশু দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করে, তাহার নাভিশ্বাসের মুহূর্ত পর্যন্ত সেই যাতনা নিরুপায়ভাবে দেখিয়া থাকি। যখন সব শেষ হইয়া যায়, তখন শোক করিব, কি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িব, ভাবিয়া পাই না। এমন কোন বিজ্ঞান আছে যাহার দ্বারা দেহের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতা নিবারণ করা যায়? যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে মানুষ এই পৈশাচিক ব্যবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া কেমন করিয়া সুখ-জীবন যাপন করিবে? অবশ্য আদি অন্তের ভাবনা রোধ করিয়া কেবল বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই বাঁচিবার চেষ্টা করিবে—জীবনপথে কেবল অগ্রসর হইতেই থাকিবে, পথ যেখানেই শেষ হউক। এই যে নিরুপায়ের উপায়, এই বাঁচিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকার সঙ্কল্প—ইহাকেই নানা নীতিকথায় মণ্ডিত করিয়া, মানুষ আসল কথাটাকে চাপা দিয়াছে। কিন্তু তবু মন যে মানে না, কেবল অসাড় হইয়া থাকে মাত্র—তাহা সকলেই জানে। জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইনা, শেষে তাহা নিরর্থক, এমন কি অনাবশ্যক বলিয়া, ফাঁসিকাঠের সম্মুখে গীতা-পাঠের মত মনকে দৃঢ় করিয়া থাকি। তথাপি মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ভয় নয়; মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মানুষের অভাব নাই—অবস্থাবিশেষে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যুকে মানুষ বহু প্রকারে জয় করিয়াছে, কিন্তু জীবনকে জয় করা দুঃসাধ্য। জীবনেরই কারা-প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য, কারণ নিজেরই হৃদ্-দেশে সেই কারারক্ষী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—মানুষ প্রতিপদে সেই অতি-দম্ভী আত্মাভিমানীর বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা যে ভয় করি, তার কারণ—"Conscience doth make cowards of us all", কারাপ্রাচীর একবার লঙ্ঘন করিতে পারিলে ভয় আর

থাকে না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই ভয়—জীবনকে বুঝিতে পারি না বলিয়াই মৃত্যুকে ভয় করি। রহস্যময়ী যদি একবার তাহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিত তাহা হইলে দুঃখ থাকিত না—তাহার সেই আবৃত-চক্ষুর ক্রূর কটাক্ষ অধরের হাসির ধারায় নির্মল নিরাময় হইয়া উঠিত।

আজ এক ভিখারী আসিয়াছিল। আগে প্রতি মাসের শেষে তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখ আমার গৃহদ্বারে দেখা দিত। অতি মলিন, শতচ্ছিন্ন অথচ ভদ্রবেশ—দীনতার প্রতিমূর্তি বলিলেও হয়; দেখিলে কেমন ভয় হয়—সে যেন মনুষ্যজীবনের আর এক অতি সাধারণ লাঞ্ছনার প্রতীক। এতদিন তাহাকে দেখি নাই, ভাবিয়াছিলাম বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে—বাঁচিয়াছে; মনুষ্যজীবনের ধিক্কার-লজ্জা-লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত যত দূর হয় ততই ভাল। আজ আবার সেই বিভীষিকা! এ যেন মরিবার নয়, দীনহীন অসহায় মনুষ্যত্বের বীজরূপে তাহাকে দীর্ঘকাল লোকালয়ে বিচরণ করিতেই হইবে! বলিল, বড় অসুখ হইয়াছিল তাই সাত আট মাস আসিতে পারে নাই। কথাটা মিথ্যা নয় নিশ্চয়। কিন্তু সেই অনশনক্লিষ্ট দেহ, সেই ক্ষীণ কণ্ঠ, সেই দুর্বল পদক্ষেপ, কোনটাই একটু বেশি বা কম নয়! সম্ভবতঃ তাহার দুঃখে জোয়ার ভাঁটা নাই—সুখেরই আছে, দুঃখের থাকে না; দিব্য একভাবেই আছে! মন সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল, বলিলাম—তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাই না, তুমি আর আসিও না। হতভাগ্য অবাক হইয়া গেল, অতিশয় আর্তকণ্ঠে বলিল, আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি বড় দুঃখী, আপনি গরীবের মা-বাপ, আমার প্রতি নির্দয় হইবেন না। কি দোষ করিয়াছে? সে মানুষের মুখ হাসাইয়াছে, সে মনুষ্যকুলের কলঙ্ক! সে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি বা শক্তির অভাবে, good-living-এর ভদ্র স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে—উত্তর তো অতিশয় সহজ! কিন্তু সে উত্তর আমার মুখে যোগাইল না। আমার চক্ষে সে একটি বিভীষিকা—নিয়তির ক্রূর পরিহাসের আর একটি মর্মভেদী অট্টরব। তাহার মধ্যে আমি মনুষ্যত্বের যে পরাজয় দেখিতেছি, তাহার কারণ আরও গভীর। জগতের মূল বিধির সঙ্গে তাহা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। সে

আমারই দশান্তরের প্রতিচ্ছবি: তাহার মধ্যে আমি আমারই, বা আমার পুত্র-পৌত্রের অতিসম্ভব ও অনিবার্য নিয়তির প্রকাশ দেখিতেছি। সেই সহানুভূতিই আমাকে বিকল করিয়াছে—আমারই প্রতি আমার নিদারুণ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছে। বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আর কিছু বলিলাম না। পাপিষ্ঠকে বড়ই অবসন্ন দেখিলাম; সে বসিয়া পড়িল, বলিল, এক মুঠা চাল ও একটু জল দিন, আর পারিতেছি না, কাল সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছি।

এই তো মানুষ। মনুষ্যজীবনের তলদেশে যে পঙ্ক রহিয়াছে তাহার দুই অঞ্জলি তুলিয়া দেখাইলাম, এই দুই-ই মানুষের আদি দুঃখ। যাহাদের মতে দেহ ও মনই সর্বস্ব, তাহাদিগকে শেষপর্যন্ত ওই পঙ্কোদ্ধার করিতেই হইবে, কিন্তু এ পঙ্ক কখনও ধৌত হইবে না। চিত্ত-প্রকর্ষ বা মানস-রসায়নের যত প্রক্রিয়াই আবিষ্কৃত হউক, এ পঙ্কের পঙ্কত্ব ঘুচিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করি, পঙ্কের উপর জল আছে,এবং পঙ্কে যে মৃণাল জন্মে তাহা হইতেই জলতল ভেদ করিয়া উর্ধ্বমুখী লতা-দণ্ডে, মুক্ত বায়ু ও আলোকের দেশে, পঙ্কজ ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল উপমা নয়, বাস্তব অর্থেও সত্য। সেই পদ্মের শোভা যাহারা দেখিয়াছে, তাহার গন্ধ-মধু আস্বাদন করিয়াছে, তাহারাই পঙ্ককে ঘৃণা না করিয়া—মানস-রসায়ন প্রয়োগে তাহাকে শোধন না করিয়া, তাহাকে সহ্য ও স্বীকার করে; আমি সে সৌভাগ্য অর্জন করি নাই, তাই দুর্বল প্রশ্নকাতর প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

সেই পদ্মের কথা শুনিয়াছি, তাহার গন্ধ-মধু পরোক্ষে উপভোগ করিয়াছি—ভোগ করি নাই; তাহা যদি করিতাম, তবে আজ এই কথার মালা গাঁথিতে বসিতাম না। ঋষি তাহাকে ধ্যানে অনুভব করিয়াছেন, কবি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। যিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন—তিনি কে? তাঁহাকে জানিব কেমন করিয়া? যে তাহা করে, সেও বোধহয় না জানিয়াই করে—আপনাকে আপনি জানে না, পরিচয় দিবে কি?

এই মানুষকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। ঋষি তাহাকে দেখিয়াছেন অতিদূরে—নিকটে চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই। কবি তাহাকে অতি নিকটে বুকের কাছে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি যেটুকু দূরে থাকা উচিত—না থাকিলে দেখার অসুবিধা হয়—সেটুকু দূরত্ব-রক্ষার চেষ্টার নাম আর্ট। এই আর্টের কত ভঙ্গিই দেখা গিয়াছে—গান, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস—কাব্যের কত রূপ-বিবর্তনই হইয়াছে! আজও তাহার শেষ নাই। ঋষি ও কবি, দুইজনেই এই পরম বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন। একজন দৃষ্টিমুগ্ধ, আর একজন সৃষ্টিলুব্ধ। ঋষির চক্ষে সে একটি জ্যোতি, সৃষ্টির মুকুরফলকে তাহা উদ্ভাসিত হয় মাত্র; সে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র,—সৃষ্টি তাহারই প্রপঞ্চ। সে অনির্বচনীয়—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। তাই তাহাকে বাণীতে ধরা অসম্ভব; তাহাকে দেখা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কবিও দেখেন, কিন্তু সে দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তিনি তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করেন, এবং রূপই তাহার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বাণীরূপ বাহু প্রসারিত করেন। রূপ এমনই যে, তাহা দেখিলেই দেখাইতে হয়; যে দেখাইতে পারে না, সে দেখেও নাই। এইরূপ—মানুষেরই প্রাণের রূপ—কবির ভাষায় যুগে যুগে প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। ঋষি তাহাকে তমসার পারে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন, কবি সেই ক্ষণ-জ্যোতিকে উর্বশীরূপে এই পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন—বিরহী পুরূরবার অশ্রুজলে সে স্থির বিম্বিত হইয়া উঠে! কিন্তু কবি ও ঋষির মধ্যে এই ব্যবধান সত্ত্বেও, উভয়ের আদিম সগোত্রতা কখনও ঘুচে নাই। কতকাল ধরিয়া উর্বশী পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই দুইয়ের মধ্যবর্তিনীরূপে বিরাজ করিয়া, কবি-ও-ঋষি পুরূরবাকে দিশে দিশে ছুটাইয়া দিশেহারা করিয়াছে—অন্তরে ধরা দিয়াও অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াছে। মানুষ তাহার জন্য সপ্তলোক সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টির সীমার বাহিরে সৃষ্টিলক্ষ্মীর আসন রচিয়াছে; নিজ নাভিগন্ধের কারণ-স্থল নির্ণয় না করিয়া কান্তারে-গহনে তাহার সন্ধান করিয়াছে। সৃষ্টির এই আনন্দরূপিণীকে ঘটে ও পটে ধরিবার জন্য কবি আকুল, ঋষি তাহার একটা

সার্বভৌমিক সত্তার আশ্বাসেই মুগ্ধ। কবির পক্ষে যাহা বস্তু, ঋষির পক্ষে তাহা তত্ত্ব; এবং বস্তু ও তত্ত্বের এই লুকাচুরি—ঋষিভাব ও কবিভাবের এই দ্বন্দ্ব—সাহিত্যে আজিও ঘুচে নাই। সে যে বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি—মানুষের আত্মা তাহার জন্যই চিরদিন ক্ষুধাতুর; এবং কবিও যেহেতু মানুষ, অতএব রূপের মধ্যে অরূপের, বস্তুর মধ্যে তত্ত্বের, ভূমির মধ্যে ভূমার ভাবনা তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকল ধর্ম, সকল নীতি, সকল আদর্শ-বাদের মূলে মানুষের এই আদি আত্মিক সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋষির ধ্যান ও কবির কল্পনা ভিন্নমুখী হইল বটে—উর্বশী অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া ভূমিতেই আসন পাতিল বটে—কিন্তু মানবের জীবনে, মানবের চরিত্রে, কবি যাহার লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার বহুত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; একটা একের আদর্শ তাঁহাকে পাইয়া বসিল—জীবনের মৃৎবিগ্রহ, মানুষের মনুষ্যত্বই, তাঁহার কল্পনাকে চরিতার্থ করিল না। একদিকে ঋষির ধ্যান, অপর-দিকে কবির প্রেম, এই দুইয়ের কোনটাই স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিল না—সৃষ্টির রসরূপ বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়, বস্তুর বস্তুরূপ রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই কবিও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, জীবনের একটা অর্থ সন্ধান করিতে হয়। দেহের যে আধি-ব্যাধি, প্রাণের যে সান্ত্বনাহীন শোক অতঃপর কবিচিত্ত মথিত করিল, তাহার সহিত সন্ধি করিবার—তাহাকে সহ্য করিবার—একটা উপায় কবিই আবিষ্কার করিলেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হত্যা করিয়াছে, তাহার শোকে ক্রৌঞ্চীর আর্তচীৎকার শুনিয়া যাঁহার কণ্ঠে আদিশ্লোক উদীরিত হইয়াছিল; সেই একান্ত ব্যক্তিগত অবিষহ্য ব্যথা যে কবির হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল—তিনি কতকাল তাহার ধ্যান করিয়া, অবশেষে সেই ব্যথাকে জয় করিবার ছলে, রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্যক্তি ছোট হইয়া গেল, মানুষ মহামানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল—জীবন হইল একটা তপস্যা, চরিত্রই হইল একমাত্র সাধনার বস্তু। প্রিয়া-বিরহে একদা যে-পুরুষ বিলাপ-ধ্বনিতে কানন-কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, লোকহিতের জন্য সেই-ই অতঃপর প্রাণসমা পত্নীকে বিসর্জন করিল—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড অনায়াসে

উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মানুষ আর মানুষ রহিল না; দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কবি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ মিথ্যা হইয়া গেল। সে মানুষের কথা নয়—মনুষ্যত্বের কথা, একটা মনঃকল্পিত সর্বমানবীয় ব্যক্তির কথা। কবি এখানে ঋষি, ইহাও কবিত্বের আর্যযুগ।

আমাদের দেশে ইহাই কাব্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাভারত মহাকাব্য হইলেও তাহা পুরাণ, কাব্য নহে। তাহার কারণ বোধহয় এই যে, তাহাতে ঘটনা, তথ্য ও তত্ত্ব এমনভাবে স্তূপীকৃত যে, তাহা কাব্যোচিত রসপরিণতি লাভ করে নাই; অথবা, তাহার ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত নয়—তাহা ইতিহাস, তাহা বাস্তব বিবৃতিমূলক রচনা। কিন্তু সেই বিরাট বিবৃতির মধ্যেই মানব-চরিত্রের যে অসংখ্য আলেখ্য এবং মানব-ভাগ্যের যে বাস্তব-রহস্য গাঢ় ও গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—কোনও একটি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মানুষের জীবনকে যে বিচিত্র ও নানা অবস্থানে দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যে এই একমাত্র গ্রন্থকে 'মানব-মহাবংশ' বা 'মানবায়ন'-মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। এই কাব্যে এক বিরাট দেশ-কালের মধ্যে কবি মানুষকে স্থাপনা করিয়াছেন; আদর্শ, নীতি ও ধর্মের কথা কিছুই বাদ দেন নাই বটে, কিন্তু মানব চরিত্রব্যাখ্যান হইতে সেগুলিকে পৃথক রাখিয়াছেন, অন্ততঃ কাহিনীর প্রধান অংশে; মানুষের কামনা ও ভাবনা এই দুই-ই পাশাপাশি থাকিয়াও সুস্পষ্ট রেখায় পৃথক হইয়া আছে—ধর্মের কথা ও মর্মের কথা দুই-ই স্বতন্ত্র মর্যাদায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় কাব্যে যে ট্র্যাজেডি অচল, অথচ মানব-মহাকাব্যের যাহা একটি অতিশয় বিশিষ্ট রস, এই মহাভারতে তাহা পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। রামায়ণের কবি যাহাকে এক অত্যুচ্চ আদর্শ-কল্পনার গীতিরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকে বাস্তব-জীবনঘটিত নাটকীয় কাব্যরসে উজ্জ্বল করিয়াছেন। পাপ, পুণ্য, চরিত্র ও বাহুবল, জ্ঞান, প্রেম, মহত্ত্ব ও নীচতা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপরিসীম দৈন্য—এ সকলের মধ্যে তিনি দুর্বল অসহায় মানুষকেই দেখিয়াছেন; মহামানব নয়—এই

পৃথিবীরই রক্তমাংসের মানুষ অতিশয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিচরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া মহাকালের অঙ্গনে যে-নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার যবনিকা অন্ধকার,—মহাভারতে সেই যবনিকা-পাত আছে; এবং তাহা নিরতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়া, মানুষ এই নটলীলায় নিযুক্ত থাকিয়াই যে সকল চিন্তা ও ভাবনা না করিয়া পারে না—যাহা তাহার জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—মহাভারতে তাহাও স্থান পাইয়াছে। তাহাতে মানুষের কামনা ও ভাবনা, তাহার প্রবৃত্তি ও প্রতিভা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে।

অতএব মহাভারতকার মানুষকেই দেখিয়াছেন, ও দেখাইয়াছেন, মানুষের প্রাণ, মন আত্মা—এই তিনেরই মিলিত চিত্র এই মহাকবির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।

জীবন জিজ্ঞাসা

সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বিশেষভাবে নিজেকে জানবার প্রথম চেষ্টা করে প্রাচীন গ্রীস দেশে ; সেখানে মানুষের জীবনের কেন্দ্র, চিন্তার কেন্দ্র ছিল নগরে—যেমনটা প্রায় সব দেশেই হয়ে থাকে। প্রাচীন কালের সুসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রাচীন গ্রীসেও ছিল—তারা মনে করত যে, যেহেতু তারা ছিল Hellenes হেল্লেনেস বা গ্রীক, সেই হেতু তারাই জগতে মানুষের মধ্যে ছিল উন্নত, তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ আর সভ্য ; আর বাকী সব জাতির মানুষ, যাদের ভাষা ছিল গ্রীকদের কাছে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য, তারা সকলে ছিল Barbaroi বার্বারোই বা বর্বর—অসভ্য। গত দুই-তিন হাজার বৎসরের বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আর নৃতত্ত্ববিদ্যা নামে নবজাত মানববিষয়ক বিজ্ঞানের বলে, তা ছাড়া পশ্চাৎপদ জাতির মানুষকে দলনে সভ্য জাতির মানুষের ক্ষমতা বা অধিকার কার্যতঃ মেনে নিয়ে—আজকাল আমরা যে-রকম ব্যাপকভাবে মানুষকে 'সভ্য' অথবা 'অসভ্য' পর্যায়ে ফেলি, সেটা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষেও, যারা আর্যভাষা-নিবদ্ধ ধর্ম আর রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিল, তারা ছিল 'আর্য', আর বাকী ছিল 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ 'মিশ্র' জাতির মানুষ। এতদ্ভিন্ন, চতুর্বর্ণের theory বা ধারণা আসাতে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে একটু অন্যভাবে, ধর্মনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ভারতবর্ষে হয়েছিল। সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীসে আর ভারতে এই ধরণের মনোভাব ছিল—নাগরিক-ই সভ্য, গ্রাম্য-ই অ-সভ্য। সংস্কৃতের 'সভ্য' শব্দের মুখ্য অর্থ—যা সভার উপযুক্ত, যেখানে পাঁচজনে ভদ্রভাবে বা বন্ধুভাবে মিলিত হয়, সেখানকার উপযুক্ত ; আদি-আর্যভাষায় 'সভ্য' মানে কোনও গোত্র বা গোষ্ঠী দলের মানুষ, এই শব্দের

ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিরূপ হচ্ছে * sebhyos, যা-থেকে অধুনা প্রায় অপ্রচলিত ইংরিজি শব্দ sib, sibling (অর্থাৎ 'আত্মীয়') উদ্ভূত হয়েছে, আর জরমান শব্দ sippe অর্থাৎ 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী'। তা হলে 'সভ্য' শব্দ মূলতঃ হচ্ছে 'গোষ্ঠী-সম্পৃক্ত'; তারপরে হল 'জনসমাগম-সম্পৃক্ত'; পরে 'ভদ্র, সংযত, সংস্কার-যুক্ত, refined, civlized,' এই-সব অর্থ সহজেই উদ্ভূত হয়।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা হালে civilized আর uncivilized শব্দ দুটি শিখলুম। নৃতত্ত্ববিদ্যা তখন শিশু-অবস্থায়, অনেকটা ইউরোপীয় শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠতা-বোধের দ্বারা চালিত সেই শিশু বিদ্যার নির্দেশে আমরা তখন মানুষকে civilized বা uncivilized পর্যায়ে ফেলতে আরম্ভ করলুম। তখন আমাদের ভাষায় এই দুই ইংরিজি শব্দের প্রতিশব্দের দরকার হল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আমরা 'সভ্য' আর তার বিপরীত 'অসভ্য' এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করলুম। এইবারে, একটি নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবার রীতি এল; সংস্কৃত 'সভ্য' আর 'অসভ্য' শব্দদ্বয় বাঙলা আর আধুনিক ভারতীয় ভাষায় তাদের আধুনিক অর্থ গ্রহণ করলে।

মানুষের সুসভ্যতা বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভের কথা আলোচনা ক'রে আমাদের জ্ঞান আর বোধ-শক্তি যতই বাড়তে লাগল, ততই এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-ভাবে দেখার আবশ্যকতা দেখা দিল. সেই সঙ্গে দেখা দিল নোতুন শব্দের আবশ্যকতাও। পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই; কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম—ঘরবাড়ি, যন্ত্র-পাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরিজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Culture (জরমানে Kultur 'কুল্‌তুর্') শব্দ রূপে। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল আর ফল

আবার ফল থেকে বীজ, তা থেকে পুনরায় গাছ; বিভিন্ন গাছের ভিতর দিয়ে এই কার্য বা গতিক্রম চলেছে। যদি এক-ই বিশাল আর ক্রমবর্ধিষ্ণু বনস্পতির ভিতরেই এই গতিক্রম কার্যকর হয়ে দেখা দিত, তা' হলে কোনও সমাজের গতিশীল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গে উপমার বস্তু পাওয়া যেত। আমরা মোটামুটি ভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture। অবশ্য একেবারে সর্বজন-স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ রূপে civilization বা সভ্যতা আর culture শব্দ দুটিকে সকলেই এইভাবে সব সময়ে ব্যবহার করে না; কিন্তু যখন কোনও জাতের বাইরেকার সভ্যতা দেখে তাকে পুরাপুরি চেনা যায়, তখন বলতে হয়— 'এহো বাহ্য', ভিতরের কথায় কী? তখন তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধন আর প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহ-জ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি, এ-সমস্তের কথা এসে যায়, এ-সমস্তকে বাহ্য 'সভ্যতা' ছাড়া আর একটা সর্বস্বরা সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। সেই সংজ্ঞাটি ইউরোপে culture শব্দের রূপে দেখা দিয়েছে।

এই culture শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ; এই শব্দ লাতীনের col 'কোল্' ধাতু থেকে হয়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন করা, পূজা করা'-ও হয়। Culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ-সাধন' বেশ হতে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চলতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙ্গল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে করে, বাঙলায় ব্যবহার করা হতে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture-অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিকভাবে গ্রহণ করে থাকবেন—যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'-র অন্তর্গত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে

যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না। 'কৃষ্টি'-র মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য', তা থেকে 'চাষ-করা ক্ষেত', তা থেকে 'ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ,' এবং তারপরে 'দেশের মানুষ, জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি'; যেমন, 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ', মানে 'পাঁচ জাতি'—প্রথম প্রথম আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা—অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ', শব্দ প্রযুক্ত হ'ত, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ প্রসার ঘটে। চাষ'-অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। Culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে, রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে ২৪।২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয়; কতকগুলি সামাজিক ধার্মিক অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর চিরপোষিত বা বংশধারানুসারে লব্ধ বোধ বা বিচার অর্থে শব্দটি রূঢ়ি হয়ে গিয়েছে। 'সংস্কৃত' শব্দটি, মূলতঃ, শুদ্ধ বা উন্নত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, উপরন্তু সংস্কৃতভাষা অর্থেও সুপ্রচলিত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। Culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন—তিনি বললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধরে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন।

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবতঃ শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার

-এরা ঠিক হয় না, একথাও বলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্বেদে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে আছে, আর এবিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত একটি অতি সুন্দর উক্তির প্রতি শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই এটি দেখে থাকবেন। শিল্পস্তুতি সম্বন্ধে উক্তিটি,

> "ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ
> দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—হস্তী,
> কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।
> আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্য
> জমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"

"(পার্থিব) শিল্প-সমূহ দেব-শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্প সমূহকেই প্রশংসা করে; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব-শিল্পের) অনুকৃতি রূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্প-দ্রব্য কী রকম? হস্তী অর্থাৎ হাতীর দাঁতের কাজ, কাংস্য বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ-নির্মিত অলঙ্কারাদি, অশ্বতরী-যুক্ত রথ—এই প্রকার। এই শিল্প-সমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।'

এখানে চমৎকার-ভাবে আত্মোন্নতি-বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে, নিজের জীবনকে ছন্দোময় করতে শিল্পের কাজ কী, তা বলা হয়েছে। রূপ-শিল্প, রূপ-কর্মও যে সংস্কৃতির সাধন, তার বিচারও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

Civilization বা সভ্যতা হচ্ছে (বিশেষ করে তার বহিরঙ্গ বা পার্থিব দিকে) মুখ্যতঃ জন সমাজের ব্যাপার—নগরের ব্যাপার। মানুষে মানুষে মেলামেশা না হলে, বুদ্ধির বিচারের আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধির জন্য মানুষকে কৃত্রিম নাগরিক আবেষ্টনী ছেড়ে কোথাও বা প্রাকৃতিক গ্রাম্য বা আরণ্য বা পার্বত্য আবেষ্টনীর

আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ভারতবর্ষের গভীরতম উপলব্ধি ঘটেছিল তপোবনে, নগর থেকে দূরে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের অবস্থিত আশ্রমে। কিন্তু ভারতের সভ্যতার, পার্থিব উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগর-ই ছিল। শহরের বস্তু বলেই উদ্ভাবনী সভ্যতাকে যে নামে ইউরোপে অভিহিত করা হয়, তার মূলে আছে লাতীন ভাষার civis শব্দ, যার অর্থ 'নগর'। লাতীন urbs শব্দের মানেও 'নগর', তা থেকে urban শব্দ, অর্থ 'নাগরিক, উন্নত, ভদ্র, সংস্কৃতিযুক্ত'। আরবদের মধ্যেও শহরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাই, যা 'মদীনা' অর্থাৎ নগরের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই ই হচ্ছে 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। 'নাগরিকতা' শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, শব্দটি বেশ উপযোগী ছিল, কিন্তু 'নগর' শব্দ থাকতে বাঙলায় 'নাগরিকতা'র একটু অর্থাবনতি ঘটেছে। 'সভা'র সঙ্গেই যা জড়িত, 'সভা' থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা 'অনুজুমন' থেকে, একত্রীভবন থেকে, যা উঠেছে তাকেই আমরা 'সভ্যতা' বলি।

যুগে যুগে elemental অর্থাৎ ঔপাদানিক বা মৌলিক ভাবকে প্রকাশ করতে যে বিভিন্ন শব্দ লোকপ্রিয় হয়ে থাকে, নোতুন আর সূক্ষ্ম নানাভাবের জন্য যে ভাবে শব্দ ভাষায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সে-সম্বন্ধে, আর civilization ও culture-এর বাঙলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে, এতক্ষণ আমি কতকটা অসংলগ্নভাবে একটু প্রসঙ্গ করলুম। আজকাল হাটে বাটে সবত্র যে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে, তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধেও দুটো কথা বললুম। এই বারে বিশেষ করে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অল্প কিছু নিবেদন করে আমার আলোচনার উপসংহার করব।

ভারতের বাহ্য বা পার্থিব সভ্যতা একটা বিরাট ব্যাপার। ভারতের এই civilization যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ও মধ্যযুগের civilization-এর চেয়ে কম নয়, সেকথা সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতিতে এই পার্থিব সভ্যতা অন্য পাঁচটি দেশের পার্থিব সভ্যতার সমপর্যায়েরই বস্তু। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতের বাস্তু, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা হস্তশিল্প, ভারতের দর্শন আর ধর্ম, ভারতের সাহিত্য—এ-সব তো আছে। কিন্তু এর প্রাণ কোথায়? ভারত-সভ্যতা-তরুর

সংস্কৃতি-পুষ্প কিভাবে ফুটে উঠেছে? সেটা একটু প্রণিধান করে দেখবার বিষয়।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতকগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ ভারতের জনগণের ইতিহাসের আধারেই দানা বেঁধেছে। নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গড়ে উঠেছে—এই-সব জাতির ভাষা আর সভ্যতা, এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য, মূলতঃ পৃথক্ ছিল। কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষী আর ভোটচীন-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ আর্যভাষা গ্রহণ করে আর্য-ভাষীদের সঙ্গে মিশে উত্তরভারতে প্রাচীন হিন্দুজাতিতে পরিণত হল। আর্য-ভাষীরা প্রথমটায় বিজেতা হয়ে আসে; বিজেতার দর্প আর দম্ভ জাত্-আর্য-ভাষীদের মধ্যে বহুদিন ধরে ছিল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু শেষটায় যখন এই-সব জাতির মিশ্রণ ঘটল, তখন, এদের নিজ-নিজ পৃথক জাতিত্ব আর সত্তা সম্বন্ধে যে বোধ ছিল, আর এই বোধ নিয়ে যে স্বাভাবিক গর্ব ছিল, সেটা লোপ পেলে —সকলেই এক নব-সৃষ্ট জাতিতে বিলীন হয়ে গেল, এক বিরাট সমন্বয়ে সকলেই যেন নিজ সার্থকতা লাভ করলে। পৃথক্ স্বজাতি-গর্ব আঁকড়ে ধরে থাকলে, মিলিত-ভাবে একটি নোতুন মিশ্র জাতির সৃজন হতে পারত না। বিভিন্ন জাতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ধর্মবিচার বা সিদ্ধান্ত, আচার-অনুষ্ঠান—এ-সব একে অপরের সামনে তুচ্ছ করে দেখবার ও দেখাবার প্রবৃত্তি আর থাকা সম্ভবপর হল না, কারণ এ-সব জিনিস এই মিশ্র জাতির জনগণের পিতৃকুলাগত বা মাতৃ-কুলাগত রিক্থ হয়ে দাঁড়াল। এই জন্য হিন্দু সভ্যতার প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হল—সমন্বয়। বিভিন্ন ধর্ম-মত বা বিচার এক-ই সত্যে পৌঁছুবার বিভিন্ন পথ মাত্র—এই বোধ ভারতীয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হল। এই পরমত-সহিষ্ণুতা ভারতের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো কথা। ভারতীয় ঔদার্য দেখিয়ে কেবল বলবে না; সব ধর্মেই বা সব সমাজেই সত্য আছে, —তবে আমার ধর্মে আর আমার সমাজেই সত্যটা পুরাপুরি বিদ্যমান; ভারতীয়

বলবে, বিভিন্ন ধার্মিক অবলোকন বা দৃষ্টি-ভঙ্গী বা দর্শন, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অবশ্যম্ভাবী রূপেই দেখা দিয়েছে, আর এই-সব দর্শন, যতক্ষণ না অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ নিজ সার্থক মহিমায় সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বিভিন্ন আপাত-বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বার করে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা, চিরকাল ধরে ভারতীয় করে এসেছে; পিতৃলোক আর পুনর্জন্ম, হোম আর পূজা, এক আর বহু দুই-ই এক সঙ্গে দেখা, পিণ্ডদানে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান, সামাজিক বিভেদ আর সামাজিক সমীকরণ—এ-সমস্তকেই ধরে নিয়ে। এদের বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার করে, এক মহান্ মিলন-সঙ্গীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা।

তারপরে, ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড় কথা হচ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তার উপলব্ধি—এই-ই হচ্ছে মানুষের প্রধান কার্য। যদি বিচারের পথে গিয়ে কেউ নাস্তিক ভাবে পৌছয়, তাতে দুঃখ নেই—নাস্তিকের সিদ্ধান্তকেও উড়িয়ে দেবার অধিকার নেই আমাদের, তাকেও জোর করে আস্তিক্যে আনবার চেষ্টা অবৈধ। প্রাচীন ভারতের আর্য আর বিভিন্ন প্রকারের অনার্য, বিশেষতঃ দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক-ভাষী অনার্য—এদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-সমূহের সমবায়ের ফল হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য-দ্বারা যে প্রার্থনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনারূপে গৃহীত হয়েছে, সেটি হচ্ছে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনা; আর এই প্রার্থনায় আমরা দুটি অংশ পাই—একটিতে হচ্ছে জগৎ-প্রপঞ্চের স্রষ্টার অনুধ্যান ('তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি' —সৃষ্টিকর্তার সেই বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি), আর অন্যটিতে এই প্রার্থনা যে, আমাদের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি যেন ভগবানের দ্বারায় পরিচালিত হয়, আমরা যেন বিধি-দত্ত বুদ্ধি ধরেই সব কাজ করে যেতে পারি ('ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—তিনি আমাদের ধীসমূহকে পরিচালিত করুন)। এই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বা আকর্ষণ থাকাতে, বহু মূর্খতা বহু গোঁড়ামি বহু অন্ধবিশ্বাস নানা

ভাবে ভারতীয় জাতিকে নানা সময়ে বিপন্ন করে তুললেও, মোটের উপর সে-সব কাটিয়ে উঠবার শক্তি এই জাতি তার সংস্কৃতির দ্বিতীয় মূলকথা এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসা থেকে পেয়েছে।

'অহিংসা' হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথা। এ অহিংসা কেবল প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি আর ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ানো নয়—এর পিছনে আছে 'করুণা' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ, আর আছে 'মৈত্রী' অর্থাৎ সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা। এই অহিংসা কেবল vegetable world বা উদ্ভিদ্-জগতের উপযোগী নিষ্ক্রিয় অথবা পর-পরিচালিত ব্যাপার নয়। এর পিছনে আছে ন্যায়-দৃষ্টি ও সহানুভূতি: আর ন্যায়-দৃষ্টি আছে বলেই হিংসার পথে মূর্তি গ্রহণ করতেও ক্ষেত্র-বিশেষে বাধা নেই।

ভারতীয় সংস্কৃতির আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে। 'দম' বা আত্ম-দমন; 'ত্যাগ' বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তু-জগতের প্রতি উপেক্ষা; 'অপ্রমাদ' অর্থাৎ নিজের বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে না করা, জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য, শিব আর সুন্দরের আবাহন—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে এই সংস্কৃতির প্রকাশ হয়েছে।

সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও একসময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নোতুন নোতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে, সমর্থও হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইস্‌লামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হচ্ছে এর অন্তর্গত সূফী দৃষ্টিকোণ, সূফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্য-যুগের ভারত সাদরে বরণ করে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেলে। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সন্তগণের

আবির্ভাব হল, ভারতের সূফী সাধকেরা এলেন; কাশ্মীরের জৈনুল-আবেদীনের মতন উদার-হৃদয় রাজার, সম্রাট আকবরের মতন 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল্ল্‌' অর্থাৎ বিশ্ব-মৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলনাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন-দ্রষ্টার প্রকাশ ঘটল। ইস্‌লামী সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ কেবল বিরোধের সংঘাত নয়। উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত-সহিষ্ণুতাকে আপাত-দৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার করতে হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মত সূফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণ-ই হচ্ছে ভারতে ইস্‌লামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ আরব-জাত ইস্‌লামও নয়, যা হচ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির মূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা ধরণের খ্রীস্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নোতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব নব শিল্প-সৃষ্টি, Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত হয়ে এক করে তুলবে।

'সাংস্কৃতিকী' (প্রথম খণ্ড)

সাহিত্য

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

উপনিষদের গল্পে আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবার ইচ্ছায় নিজের ধনসম্পত্তি তাঁর দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে এক পত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমি পাই, তাতে কি অমৃতত্ব লাভ করব? ঋষি উত্তর দিলেন — না, অন্য সম্পত্তিশালী লোকের মতো সুখে জীবন কাটাবে, বিত্ত দিয়ে তো কখনো অমৃতত্ব পাওয়া যায় না। মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত প্রত্যুত্তর সকলের জানা আছে — যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ — যা দিয়ে অমৃতত্ব না পাব; তাতে আমার কী প্রয়োজন। ঋষির অন্য পত্নী কাত্যায়নী স্বামীর প্রস্তাবে কী বলেছিলেন, উপনিষদে তার খবর নেই। নিশ্চয় অমৃতত্ব পাওয়া যায় না বলে ধনসম্পত্তি তুচ্ছ, একথা তিনি মনে করেন নি।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মূর্তির প্রতীক। পৃথিবীর অন্য-সব জীবজন্তুর মতো শরীর ও মন নিয়ে মানুষ। এবং তাদের মতোই মানুষের মনের বড়ো অংশ ব্যয় হয় শরীরের প্রয়োজনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি তার বেশির ভাগ এবং অনেক সভ্যতার প্রায় সমস্তটা শরীরের প্রয়োজন ও বিলাসের দাবি মেটাবার কৌশল। ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, রেল-স্টীমার, মোটর-এরোপ্লেন, টেলিফোন-রেডিয়ো, কলকজা, কৃষি-বাণিজ্য — মুখ্যত এই কৌশল ছাড়া কিছু নয়। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে বুদ্ধি অর্থাৎ মন কাজ করেছে, তার শক্তি ও জটিলতা বিস্ময়কর। কিন্তু তার লক্ষ্য সেই-সব প্রেরণার লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, যাতে পাখিরা বাসা বাঁধে, মাকড়সা শিকার ধরার আশ্চর্য কৌশল দেখায়, হাঁসের দল প্রতি শীতে উত্তর-ইউরোপ থেকে বাংলার পদ্মার চরে পথ না ভুলে পৌঁছে যায়। কিন্তু

সভ্যতার এই কাত্যায়নী-মূর্তি তার সমগ্র চেহারা নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব আজও অজ্ঞাত রহস্য, তার চেয়ে গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টিতে মন যে পরম সহায় এবং সে কাজে তার চেষ্টা যে ব্যাপক ও বিচিত্র—এ অতি স্পষ্ট। এবং মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্যও স্পষ্ট যে, প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। মানুষের এই অবশেষ মন, শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এ সৃষ্টি অলৌকিক। সে প্রয়োজন মেটাবার যে চেষ্টা তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি খেলামাত্র। লীলা নাম দিলে হয়তো ভদ্র ও গভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।

খেলাই হোক আর লীলাই হোক, সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী-মূর্তি তার অন্য মূর্তির মতোই স্বাভাবিক। শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের মনের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্টি, তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। মনের এই খেলার বীজ পশুপক্ষীর মধ্যেই আছে। আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে পশুপক্ষীদের গতিবিধি সবই তাদের শরীরের প্রয়োজনে নয়। তাদের এমন-সব চেষ্টা আছে, যার ফল কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দ। পশুপক্ষীর মনের তুলনায় মানুষের মন বিরাট; সুতরাং সে মনের লৌকিক সৃষ্টিও যেমন বিশাল অলৌকিক সৃষ্টিও তেমনি বিচিত্র।

আমরা যাকে সাহিত্য বলি, তা সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী-মূর্তির একদিক। যেমন তার অন্য নানা দিক—ছবি, ভাস্কর্য, সংগীত, কর্ম-গন্ধহীন শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা। সাহিত্যের এই জন্মকথা স্মরণে রাখলে তার স্বরূপ ও আদর্শ নিয়ে যে-সব বিচারবিতর্ক, তার আলোচনা ও সমাধানের সুবিধা হয়। আধুনিক কালে

নানা আকারে এ প্রশ্ন উঠেছে যে, সাহিত্যের কী লক্ষ্য। সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও মঙ্গল কি তার লক্ষ্য, না, তার কাজ কেবল মনকে এক রকম আনন্দ দেওয়া, যার নাম সাহিত্যিক আনন্দ? আর, যদি তাই হয় তবে সে বস্তুর মূল্য কী? প্রাচীন কালেও যে এ তর্ক ওঠে নি, তা নয়। আমাদের দেশের আলংকারিকদের এক দল বলেছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোককে কর্তব্য-অকর্তব্যের উপদেশ দেওয়া, যেমন রামায়ণ উপদেশ দেয় যে রামের মতো হবে; রাবণের মতো নয়। কিন্তু কাব্যের উপদেশ গুরু মহাশয়ের শুষ্ক উপদেশ নয়, কান্তার উপদেশের মতো মধুর উপদেশ। আশা করা যায় এই সৌভাগ্যবান আলংকারিকদের প্রিয়বাদিনী কান্তারা সব সময় মধুর বাক্যেই উপদেশ দিতেন। যা হোক, এঁদের কথা এই যে, কাব্য স্মৃতিশাস্ত্রের মতো উচিত-অনুচিত জানিয়ে দেয় না, এমন চিত্র ও চরিত্রের সৃষ্টি করে, যাতে পাঠকের মন মঙ্গলের দিকেই উন্মুখ ও অমঙ্গলের দিকে বিমুখ হয়। এবং সেই কাজই কাব্যের লক্ষ্য। এ মতকে উপহাস করে অন্য দল আলংকারিক, যেমন দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, বলেছেন যে, যাঁরা অমৃতনিস্যন্দী কাব্যেও উপদেশ খোঁজেন, তাঁরা সাধুলোক, কিন্তু অল্পবুদ্ধি। অর্থাৎ কাব্যের লক্ষ্য—পাঠককে কাব্যপাঠের যে বিশেষ আনন্দ, সেই আনন্দ দেওয়া; আর কিছু নয়।

এই মতবিরোধের আলোচনায় প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার, যা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এ প্রসঙ্গে যা সব সময়ে মনে থাকে না। সাহিত্য কি কাব্য মতবাদীদের কল্পিত কোনো বস্তু নয়। সাহিত্যিক ও কবির প্রতিভা যা সৃষ্টি করে, এবং সাহিত্য ও কাব্য ব'লে বিদগ্ধসমাজে যা গ্রাহ্য হয়, সেই বস্তুর প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা। এ কথা মনে রেখে বিচার করলে সহজেই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও কাব্য বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য যার মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণ কি মহাভারতের কবির লক্ষ্য ছিল সমাজের মঙ্গল, এ তর্ক তোলা কঠিন নয়। রঘুবংশ কি শকুন্তলায় এ লক্ষ্য আবিষ্কার করাও হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু ঋতুসংহার ও মেঘদূতও তো কাব্য। ভরসা করা যায়, একথা কেউ বলবে না

যে, যক্ষের বিরহবর্ণনায় কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল উপরওয়ালার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার থেকে লোকদের নিবৃত্ত করা, এবং মেঘদূত পাঠের ফল সেই উপদেশ-লাভ কাদম্বরী কি Alice in Wonderland-এর কী উপদেশ? My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense,' 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে'—কোন্ উপদেশ বা মঙ্গল এদের লক্ষ্য? মোট কথা, সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত, তবে খুব মনোরম ছলে, এ মত সত্যিকারের কাব্য-পরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটি মনগড়া তত্ত্ব।

এর উত্তরে বলা চলে যে, এগুলি ব্যতিক্রম। হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হলে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য বলে চলে যায়; মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই, সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। এই হিতবাদ, যাদের বলে প্রাচীনপন্থী, তাদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য; আর তিনি যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য; কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্যবিচারে দু-জনার দৃষ্টিভঙ্গী এক। 'যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়'।

সুতরাং এ প্রশ্ন তুলতেই হয়, মানুষের মনের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য কেন হবে সমাজের মঙ্গলসাধন। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক মঙ্গল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীর ও প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টি। শরীর ও প্রাণের প্রতি যে মায়া, আমাদের মীমাংসকদের ভাষায়, তা রাগপ্রাপ্ত—অর্থাৎ তা স্বভাবতই আছে, কোনো যুক্তি ও উপদেশের তা ফল নয়। পশুপক্ষী ও মানুষে তা সমান। এই মায়ার প্রেরণায় মানুষের মনের যা সব সৃষ্টি, তার চরম মূল্য স্বীকারে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, সেই সৃষ্টিতেই মানুষের সভ্যজীবনযাপন সম্ভব হয়েছে। মনের অন্য কোনো সৃষ্টির যদি মূল্যও থাকে, এ সৃষ্টির ভিত্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে

বনে যাওয়া চলে, কিন্তু কাত্যায়নীকে ছেড়ে ঘরকন্না চলে না। কিন্তু মানুষের মন যে কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্যই সৃষ্টি করে, এও তো স্বাভাবিক; কারণ, এ রকম সৃষ্টি মানুষ করেছে ও করছে। তবে বলতে হয়, যেমন সভ্য-সমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই মঙ্গলের জন্যই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।

এই মতকে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ, কি দেহসর্বস্ববাদ নাম দিয়ে হেয় করার চেষ্টায় লাভ নেই। কিন্তু প্রাণের উপর স্বাভাবিক মায়ায় তার মঙ্গলের উপায়ের নিঃসংশয় মূল্যবোধ ছাড়া এ মতের অন্য কোনো ভিত্তিও নেই। সামাজিক মঙ্গল কেন কাম্য সে প্রশ্ন এ তোলে না, মেনে নেয়। তাই কেন একমাত্র কাম্য, সে প্রশ্নও তোলে না, মেনে নেয়। অর্থাৎ উপায় নিয়ে তর্ক চলে, উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। কোনো-কিছু অন্য-কিছুর সদুপায় কি না, এটা তর্কের কথা; কারণ, প্রমাণের বিষয়। কিন্তু কোনো জিনিস তার নিজের জন্যই কাম্য কি না, এটা প্রমাণের বিষয় নয়, রুচির কথা। অন্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ সাহিত্যিক আনন্দ কাম্য কি না, তা যাঁর মন কাম্য বলে জেনেছে, তার কাছেই কাম্য—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। সে বোধ যার মনে নেই, তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না। সাহিত্যিক আনন্দ যে সেই আনন্দে শেষ হয়েই অমূল্য, আলংকারিকদের ভাষায় মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ সম্ভব নয়—সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

'কাব্যজিজ্ঞাসা'

উপন্যাসের পূর্বসূচনা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা :

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদেব দেশে যে-সব নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীব কোন দেশেরই পুবাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। পুরাতন যুগের আকাশ-বাতাসের মধ্যে ইহার জন্ম সম্ভবপর নয়। আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। সর্বশ্রেণীর সা ি ত্যেব মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রেব প্রভাবান্বিত। এই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। উপন্যাস যে সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা অতীতকালেব সমাজ হইতে অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন হওয়া চাই। প্রথমতঃ, মধ্যযুগের সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মানুষের মুক্তিলাভ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব উদ্‌বোধন উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মধ্যযুগে সমাজ কতকগুলি সনাতন অপরিবর্তনীয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে এবং মানুষ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া আপনাকে কোন একটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ও সেই শ্রেণীর মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে আত্মবিলোপ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ও উপন্যাসের আবির্ভাবের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ আর আপনাকে একটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া রাখিতে চায় না; সমুদয় সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া

তোলা তাহার একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়াছে। এই ব্যক্তিত্ব-বোধের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের আবির্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের মনেও যে একটা আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়া উঠে ও যাহা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহাও উপন্যাস-সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। উপন্যাসের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব এখানেও সুপরিস্ফুট। প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় প্রধানতঃ অতি মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ; ইহা সাধারণ লোকের বিশেষ ধার ধারে না। যে সমস্ত স্থলে সাধারণ মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে, সেখানে সে দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া—নিজের মনুষ্যত্বের জোরে নহে। পক্ষান্তরে, অতি সামান্য লোকের দৈনিক জীবন লিপিবদ্ধ করা ও উহা হইতে জীবন-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ, ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলাই উপন্যাসের প্রধান কার্য। সুতরাং কোন দেশের সামাজিক অবস্থার এই সমস্ত পরিবর্তন সংসাধিত না হইলে, তাহা উপন্যাসের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে পারে না। এই সমস্ত কারণের জন্যই উপন্যাসের আধুনিকত্ব, বর্তমান-যুগের পূর্বে, গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের পূর্বে, ইহার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।

অবশ্য উপন্যাস যে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মত সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও ইহার ক্ষীণ সংকেত ও সুদূর ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতায়, আখ্যায়িকায় (narrative poetry) ও নাটকে, যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সমাজের একটি বাস্তব-চিত্র প্রতিফলিত হয়, যেখানেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায় বা সামাজিক মনুষ্যের সম্পর্ক ও সংঘাত ফুটিয়া উঠে, সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে। উপন্যাসের জন্ম হইবার পূর্বেই, উহার লক্ষণ ও উপাদানগুলি বিক্ষিপ্ত – বিপর্যস্তভাবে সাহিত্যের মধ্যে ছড়ান থাকে। তারপর যথাসময়ে কোন প্রতিভাবান্ লেখক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত

করিয়া ও তাহাদিগকে একটি বাস্তব আখ্যায়িকার মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া, একপ্রকার নূতন সাহিত্যের জন্ম দান করেন ও চিরপ্রবহমান সাহিত্য-স্রোতকে নূতন প্রণালীতে সঞ্চারিত করেন।

২। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা :

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ও সমস্ত ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যায়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতে ও পৌরাণিক সাহিত্যে, সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ও ঐশীশক্তির বিকাশের মধ্যে, সময়ে সময়ে বাস্তব সমাজচিত্রের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ও বাস্তব মনুষ্যের অকৃত্রিম সুখ দুঃখের মৃদু প্রতিধ্বনি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেব দেবীর স্তুতিগান ও ভক্তি-উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া, অতিপ্রাকৃতের কুহেলিকাময় যবনিকা ভেদ করিয়া, যে ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা দেশকালনিরপেক্ষ মানবহৃদয়েরই বাণী বলিয়া আমরা চিনিতে পারি। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে এই সমস্ত বাস্তবতার ছাপ-মারা দৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা ও আধুনিক সাহিত্যের সহিত তাহাদের প্রকৃত যোগসূত্র আবিষ্কার করা কাব্যামোদীর একটি প্রধান আনন্দ। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য,—'কথা-সরিৎসাগর,' 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হইয়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ, সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনায়, বাস্তবতার সুরটি অধিকতর তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত, ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানুষকে একটি নূতন ঐক্য ও সাম্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং চির-প্রথাগত রাজন্য ও অভিজাতবর্গের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে নিজ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

৩। পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতক :

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে বৌদ্ধ জাতকগুলি ঈসপের গল্প বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অনুরূপ ও তাহাদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রচার ও বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দানই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং অনৈসর্গিক, অতি-প্রাকৃত ব্যাপার ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান আছে। আবার ঈসপের গল্পের মত পশুপক্ষীর ব্যবহার ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্র-সমালোচনা ও তাহাকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও খুব পরিস্ফুট। তথাপি বাস্তব রসধারা ইহাদের মধ্যে প্রচুরতর স্রোতে প্রবাহিত; সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, গল্প বলিবার একটা বিশেষ নিপুণতা ও কৌশল এবং বাস্তব জীবনের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ইহাদিগকে সমজাতীয় অন্যান্য গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে' নীতিজ্ঞান বাস্তবতাকে অভিভূত করিয়াছে; গল্পের অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষার কঙ্কাল সুস্পষ্ট ভাবেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পশুপক্ষীর কথোপকথনের মধ্যে কোন বিশেষ সরসতা, গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে কোন বিশেষ উৎকর্ষ বা নাটকোচিত গুণ-বিকাশের চেষ্টা, কিছুই খুঁজিয়া পাই না। লেখকের দৃষ্টি কেবল মানব-জীবন সম্বন্ধে খুব সাধারণ রকম অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতিজ্ঞান বা ব্যবহার-চাতুর্যের প্রতিই আবদ্ধ আছে। এই নীতিটিকে সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে স্মরণীয়ভাবে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টাতেই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিকে বহির্জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল দৃশ্য হইতে নিবর্তিত করিয়া অন্তর্জগতের শুষ্ক নীতি-নিষ্কাশন-কার্যেই প্রেরণ করিয়াছেন। গল্পগুলিও যেন দেবভাষার শব্দাড়ম্বরে এবং সমাস ও সন্ধিবাহুল্যে ব্যথিত-গতি হইয়া নিতান্ত ক্ষীণ ও মন্থর পদে চলিয়াছে। তাহারা যেন তাহাদের অন্তর্নিহিত নীতিসারটুকু বাহির করিয়া দিতেই অত্যন্ত ব্যগ্র; কোনমতে নিজদিগকে নিঃশেষ করিয়া তাহাদের কুক্ষিগত নীতিটুকু উদ্গার করিয়া দিলেই যেন তাহারা বাঁচে। শিক্ষা দিবার প্রবল আগ্রহেই তাহারা আপনাদের জীবনী-

শক্তিকে নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে। অবাধ্য, দুঃশীল রাজপুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্যই যে তাহাদের জন্ম এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষ্ণুশর্মা যে তাহাদের লেখক—তাহাদের এই গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে তাহারা মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয় নাই। তাহারা তাহাদের এই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছিল, দুঃশীল রাজপুত্রদের দুঃশীলতাকে এক অবসর-সংক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনদিকে সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত নাই, এবং এই অখণ্ডনীয় প্রমাণের অভাবে যদি আমরা তাহাদের সংস্কারকোচিত শক্তিতে সন্দিহান হই, তবে বোধহয় আমাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

অবশ্য ঈসপের গল্পগুলি গল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে এতটা বিপথগামী হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও নীতি-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, এবং প্রত্যেক গল্পের শেষে নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিলেও, নীতিগল্পকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে নাই। ঈসপের গল্পগুলি সহজ, সরল ভাষায় রচিত, অলঙ্কার-বাহুল্যে অযথা ভারাক্রান্ত নহে; সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র ন্যায় তাহাদের বাস্তব জীবনের সহিত ব্যবধান এত বেশি নয়। তথাপি গল্প হিসাবে তাহাদের কোন বিশেষত্ব নাই; গল্পটি বলিবার মধ্যে এমন কোন বিশেষ ভঙ্গী, এমন কোন সরসতা নাই, যাহা আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে। গল্পের অন্তর্নিহিত রসটি ফুটাইয়া তোলা বা সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাহার আখ্যান-অংশটিকে সজীব ও লীলায়িত করিয়া তোলার কোন চেষ্টা নাই। গল্পটি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে, যেন এক নিঃশ্বাসে সারিয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে উপদেশটি বাহির করিয়া লইতেই লেখক ব্যস্ত। গল্পের মধ্যে বাস্তবতার একটি ক্ষীণ সুর আমাদের কানে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু এই ক্ষীণ বাস্তবতার মধ্যে জীবনের সহিত কোন নিবিড় সংস্পর্শের আভাস পাওয়া যায় না। মোট-কথা, ইহাদের মধ্যে খাঁটি গল্পের প্রতি লেখকের অবিমিশ্র অনুরাগের পরিচয় বড় একটা মেলে না। মানব-সমাজের যে আদিম অবস্থায় গল্প-বর্ণিত ঘটনাগুলি জীবনের প্রকৃত সমস্যার বিষয় ছিল, আমরা সেই অবস্থা হইতে

এখন বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি; সেই ঘটনাগুলি এখন আমাদের বাস্তব-জীবনের মধ্যে আর প্রতিফলিত হয় না। কেবল তাহাদের অন্তর্নিহিত উপদেশগুলি আমাদের বর্তমান জটিলতর অবস্থার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রয়োগ করা হয় মাত্র; অর্থাৎ আমাদের নিকট গল্পের কোন মূল্য নাই, উপদেশটিরই যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আছে। সামাজিক যে অবস্থায় বক সিংহের গলায় নিজের ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া পুরস্কার চাহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল, বা সিংহচর্মাবৃত গর্দভ আপনাকে সিংহ বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, আমাদের বর্তমান জীবনে সেই অবস্থাগুলির পুনরাবৃত্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাহাদের নীতি-অংশটুকুই আমাদের অভিজ্ঞতার অংশীভূত হইয়া বর্তমানের অধিকতর জটিল ও সমস্যা-সংকুল পথে আমাদিগকে সাবধানে পদক্ষেপ করিতে শিক্ষা দেয় মাত্র। অবশ্য ঈসপের দুই একটি গল্পের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্যার চিহ্ন পাওয়া যায়; যেমন অন্য জন্তুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার জন্য অশ্বের মনুষ্যকে আহ্বান ও মনুষ্যের নিকট তাহার অধীনতা-স্বীকার নিঃসন্দেহ একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যার আভাস দেয়; কিন্তু মোটের উপর পূর্ব মন্তব্য ঈসপের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

গল্প-হিসাবে বৌদ্ধ জাতকগুলি 'পঞ্চতন্ত্র' ও ঈসপের গল্প হইতে সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। বাস্তব জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ ইহাদের প্রত্যেকটির উপর অত্যন্ত গভীরভাবে মুদ্রিত। প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া, ইহার সহিত আমাদের যেরূপ বিস্তারিত ও ব্যাপক পরিচয় আছে এমন বোধ হয় ইস্‌লাম ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের সহিত নাই। ইহার রীতি-নীতি ও অনুশাসন, ইহার কার্য-প্রণালী ও ধর্ম-বিস্তার-চেষ্টা, বিশেষতঃ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ, প্রাত্যহিক সম্পর্ক—এ সমস্তই আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। হিন্দুধর্মের ভিতরে একটা প্রবল অনাসক্তির, একটা বিশাল ঔদাসীন্যের ভাব জড়িত রহিয়াছে। ঋষির তপোবন গৃহীর প্রাত্যহিক জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শের চিহ্ন অতি বিরল। তপোবনের আদর্শ শান্তি গৃহস্থের শত

শত ক্ষুদ্র কলরবে, তুচ্ছ কোলাহলের দ্বারা বিচলিত হয় নাই। কচিৎ কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা ঋষির চরণোপান্তে শিষ্যের ন্যায় আসিয়া প্রণত হইয়াছেন; ঋষিও তাঁহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করাইয়াছেন; তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কৌতূহল-প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই। অথবা সময়ে সময়ে ঋষিই কোন বিশেষ প্রয়োজনে তপোবনের পবিত্র গণ্ডী ছাড়াইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং কার্য শেষ হইলেই নিজ আশ্রমের নিভৃত, ছায়াস্নিগ্ধ কোণে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মোট কথা, হিন্দুধর্মে এক বিরল প্রয়োজন ছাড়া তপোবন ও গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী সংযোগ-সেতু নির্মিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে আশ্রম ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুরা প্রতিদিনই গ্রাম বা নগরের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা ও ধর্মদেশনার জন্য যাইতেন এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইতেন—আশ্রম হইতে গ্রামের পথখানি সর্বদাই গমনাগমনের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রত্যেক তুচ্ছ কলহ বা অশান্তির কারণ লইয়া বুদ্ধের চরণে নিবেদন করিতে আসিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ লইয়া ফিরিত। এই সাধারণ জীবনের সহিত নৈকট্যই বৌদ্ধ জাতকগুলির গল্পাংশের উৎকর্ষের কারণ হইয়াছে।

এই বাস্তব-নৈকট্যের নিদর্শন জাতকগুলির মধ্যে অজস্র প্রাচুর্যের সহিত বিক্ষিপ্ত। ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের নানা সমস্যা, তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের জীবন-যাত্রা, এমন কি পশুপক্ষীর ও বুদ্ধদেবের চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্রই এই বাস্তবতা-গ্রহণ মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি ইহাদের ভাবা ও উপমা-উদাহরণ-নির্বাচনের মধ্যেও এই বাস্তবতার চিহ্ন সুপ্রকট। সামান্য দুই একটি উদাহরণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের প্রত্যেক সমস্যা, প্রত্যেক প্রকারের প্রলোভন,

ধর্মবিষয়ক প্রত্যেক প্রকারের মতভেদ ও বাদানুবাদ, ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও ঈর্ষ্যা, ধর্মোপদেশ-পালনে নিষ্ঠা ও শৈথিল্য, ভক্তি ও ভণ্ডামি—এই সমস্ত ব্যাপারেরই একটা নিখুঁত, জীবন্ত ছবি জাতকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের প্রকৃতিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-পিপাসা ও উচ্চাভিলাষ বিলয় প্রাপ্ত হয় না তাহা ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। নির্বাণ-প্রদ শাসনে অবস্থিত হইয়াও ভিক্ষুরা উৎকৃষ্ট ভোজ্য, চীবর ও বাসস্থানের মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই, অন্তরের গূঢ় শঠতা ও অভিমান বিসর্জন দিতে পারে নাই। আশ্রমের মধ্যেই এই আদিম ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে; ভিক্ষুরা পরস্পর কলহ করিতেছে, ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া মিথ্যানিন্দা প্রচার করিতেছে; স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে অহংকার-স্ফীত হইতেছে; কোন নির্বোধ বুদ্ধির অতীত বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কেহ বা অপর সকলকে সঞ্চয়ের দোষ দেখাইয়া তাহাদেরই পরিত্যক্ত পাত্র-চীবরে আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে; কেহ বা জীর্ণ চীবরকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার দ্বারা অপরকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, ও তৎপরিবর্তে নূতন চীবর ঠকাইয়া লইতেছে (বক-জাতক, ৩য়)। এই প্রকারের বাস্তব জীবনের ঘটনাসন্নিবেশে জাতকগুলি বিশেষ উপভোগ্য ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

আবার সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবন-বর্ণনাতেও এই বাস্তবতার প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিষয়-নির্বাচনে ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে একটা নূতনত্ব, সাধারণ পরিচিত প্রণালীকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা সর্বত্রই পরিস্ফুট। সাধারণতঃ গল্প যে সমস্ত বাঁধা-ধরা মামুলি ঘটনাতেই (conventional situation) আবদ্ধ থাকে, জাতকে তাহা হয় নাই। শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে গিয়া কিরূপে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; ধূর্তেরা অর্থলোভে কিরূপে ধনীদের মদ্যে বিষ মিশাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এক মূর্খ শৌণ্ডিক কিরূপে তাহার মদ্য অতিরিক্ত লবণাক্ত করিয়া স্বীয় ব্যবসায় নষ্ট করিয়াছিল; এক প্রত্যন্ত প্রদেশের শাসনকর্তা কিরূপে দস্যুদের সহিত লুণ্ঠিত

ধনের অংশ লইবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে জনপদ লুণ্ঠন করিতে দিয়াছিল (খরস্বর-জাতক); একজন বণিক্ কিরূপে নিজ অমঙ্গলসূচক নামের ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল (কালকর্ণী ও নাম-সিদ্ধিক-জাতক); একজন দাসপুত্র কিরূপে আপনাকে নিজ প্রভুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া সেবাগুণে প্রভুর ক্ষমা ও প্রসাদ পাইয়াছিল (কটাহক-জাতক); একজন নাপিতপুত্র কিরূপে উচ্চকুলজাত লিচ্ছবি বংশের রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল (শৃগাল-জাতক); এক গৃহস্থ কিরূপে মহামারীর সময়ে গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইয়া নিজ জীবন রক্ষা করিয়াছিল (কচ্ছপ-জাতক); এই সমস্ত জীবনের বিচিত্র, বিবিধ ঘটনায় জাতকগুলি পূর্ণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য প্রাচীন গল্পের সহিত তুলনায় জাতকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীতি-প্রচারের জন্য গল্পকে বলি দেওয়া হয় নাই। গল্পটিকে মনোহর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পশু-বিষয়ক গল্প ও অনৈসর্গিকের অবতারণা যথেষ্ট আছে—কোন দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য হইতে এই অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জন করা সম্ভবপর ছিল না—কিন্তু সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে বাস্তব রসধারার প্রবাহ খণ্ডিত ও প্রতিহত হয় নাই। পশু-বিষয়ক গল্পের মধ্যেও যে-পরিমাণ পরিহাস-রস, বাস্তব বর্ণনা ও পশুদের প্রকৃত স্বভাব ও ব্যবহার ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে তদনুরূপ কিছুই দেখিতে পাই না। কুন্তলকুক্ষি সৈন্ধব-জাতক, কৃষ্ণ-জাতক, বক-জাতক, কাক-জাতক—এই সমস্তই পশু-বিষয়ক জাতকগুলির বাস্তবতা-প্রাধান্যের উদাহরণ। 'পঞ্চতন্ত্রে' যে জরদ্গবের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই গৃধ্র বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না; তাহার গৃধ্রোচিত কোন লক্ষণই আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে পঙ্কনিমগ্ন শার্দূল ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পথিককে কঙ্কণ লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই বনের বাঘ বলিয়া চিনিতে পারি না; সংস্কৃত শ্লোকের আতিশয্যে, সাধুভাষার আড়ম্বরে তাহার শার্দূল-প্রকৃতি, ব্যাঘ্রোচিত নখর-দংষ্ট্রা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

ঈসপের গল্পগুলিতে যেমন একদিকে নীতি কথার বাহুল্য নাই, তেমনি অপর-দিকে সরস বাস্তব বর্ণনারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, পশুদের বিশেষ প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অবশ্য জাতকেও যে এই দোষের অভাব আছে, তাহা বলা যায় না; সেখানেও হস্তী, মর্কট, তিত্তির প্রভৃতি পশুপক্ষীর মুখে বুদ্ধমাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও পঞ্চশীলের গুণগান শোনা যায়। কিন্তু লেখক ইহার মধ্যেও এমন বাস্তব বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, পশুপক্ষীদের প্রকৃতিসুলভ দুই একটি লক্ষণের এমন সুকৌশলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহাদের প্রকৃত রূপ চিনিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

আরও নানাদিক্ দিয়া জাতকের মধ্যে এই বাস্তবতাগুণের স্ফুরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের কাহিনী যে পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জনসাধারণের যেরূপ প্রভাব দেখা যায়, হিন্দুধর্মে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কাজেই জাতকের মধ্যে শিল্পী, বণিক, শ্রেষ্ঠী, কর্মকার, সূত্রধর, প্রভৃতি সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। বরঞ্চ রাজা-উজীরের বর্ণনাগুলি অনেকটা মামুলি ধরণের ও বিশেষত্ববর্জিত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর চিত্রে লেখকের সত্যানুরাগ ও বাস্তবানুগামিত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আবার বুদ্ধের নিজের চরিত্রও যতদূর সম্ভব অতিরঞ্জন-বর্জিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক বুদ্ধ-চরিত্রের অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখাইতে বিশেষ কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু তথাপি সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক অত্যুক্তি-প্রবণতার সহিত তুলনা করিলে জাতকের ভাষার মধ্যেও একটা সংযম ও পরিমিত ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব যে কেবল রাজকুল ও অভিজাত বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে নিতান্ত নীচকুলোদ্ভূত করিয়াও দেখান হইয়াছে। তিনি যে সকল সময়ে একটা আদর্শ, অপরিম্লান পুণ্য জ্যোতির মধ্যে বাস করিয়াছেন তাহাও নহে, অনেক জাতকেই তাঁহার পদস্খলন ও নির্বুদ্ধিতার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি অনেক জাতকে

নিতান্ত নীচ ও হেয়বৃত্ত্যনুসারী বলিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছেন—এমন কি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সকল ধর্মেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে আদর্শ-চরিত্র ও অতিমানবগুণের অধিকারী বলিয়া দেখান হয়, কিন্তু জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত-বর্ণনে এই সর্বধর্ম-সাধারণ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের চরিত্র-বর্ণনে বাস্তবানুরক্তির পরিচয় দিয়া জাতককার যে আশ্চর্য সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে সুলভ নহে।

এই বাস্তব ফ্রেমে আঁটা বলিয়া জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষ এত বেশী। 'পঞ্চতন্ত্র' বা ঈসপের গল্পগুলিতে তাহাদের বর্তমান উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কোন পরিচয় মেলে না; বাস্তব জীবনে তাহাদের ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ থাকি। তাহারা যেন কতকগুলি সর্বদেশসাধারণ, মানবপ্রকৃতিসুলভ কাল্পনিক অবস্থার চিত্র বলিয়া মনে হয়—কোন বিশেষ-দেশের মৃত্তিকার সহিত তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না, কোন বিশেষ জাতির জীবনীরস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করি না; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যেই তাহাদের মূল গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপন্যাসলেখকের মনোভাব (mentality) সম্পূর্ণভাবে প্রকট। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সরস বর্ণনাই ভাবী ঔপন্যাসিকের প্রথম গুণ; প্রাচীন সাহিত্যে ঠিক এই মনোবৃত্তির অভাবই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন লেখকেরা যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির গৌরব ও কথাসম্পদ্ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিক মতের অভ্রভেদী স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহার তলে এই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলি প্রোথিত করিয়া ফেলেন। মহাকাব্যে জীবনের বীরত্বপূর্ণ, বৃহৎ বিকাশগুলিকেই ফুটাইয়া তোলেন, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিকে, ঘরের ছোটখাটো হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখগুলিকে সাহিত্যের অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া যান। অথচ এই অতি-পরিচিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে লক্ষ্য ও তাহাদের অন্তর্নিহিত রসটি উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিতেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত আছে। সেইজন্য ইংরেজী

সাহিত্যে চসারকেই আমরা ভাবী ঔপন্যাসিকের নিকটতম জ্ঞাতি ও পূর্বপুরুষ বলিয়া সহজেই অনুভব করি। তিনি ঔপন্যাসিক না হইলেও উপন্যাসের উপাদান ও ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আমাদের প্রাচীন-সাহিত্যে যদি বা বহু অনুসন্ধানের পরে দুই একটি বাস্তব-চিহ্নাঙ্কিত দৃষ্টের সন্ধান মিলে, কিন্তু তখনই যেন মনে হয় যে, লেখক নিজ দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া এই বাস্তবতার চিহ্নটি যথাসাধ্য লোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; বাস্তব অংশগুলিকে কল্পনা বা আদর্শবাদের সাহায্যে যথাসম্ভব রূপান্তরিত করিয়া, এই দরিদ্রের সন্তানগুলিকে সাহিত্যোচিত রাজবেশ পরাইয়া সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে বাস্তবতার এই বিরাট দৈন্যের মধ্যে জাতকগুলির বাস্তব প্রতিবেশ যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ন্যায়, আরো উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখিয়া সত্যই মনে হয় যে, পরবর্তী যুগে যদি এই গল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, বাস্তবের সহিত নিবিড় স্পর্শের বাধা না ঘটিত, তবে বোধ-হয় আমরাই সর্বপ্রথমে উপন্যাস-আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিতে পারিতাম; এবং তাহা হইলে বোধহয় উপন্যাসকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে, বিদেশীয়-ভাব-বিকৃত হইয়া, খিড়কি দরজা দিয়া আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে হইত না।

পূর্বে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে সহজেই বোধ হইবে যে, জাতকগুলি উপন্যাসোচিত গুণে বিশেষ সমৃদ্ধ; তাহাদের মধ্যে যে কেবল বাস্তব উপাদানই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তাহা নহে; একটা প্রবল বাস্তবতাপ্রবণ মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই বিষয়েই তাহারা যে উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও অগ্রদূতের গৌরব দাবি করিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ।

*'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'।

অশোকের ধর্মনীতি

প্রবোধচন্দ্র সেন

আমরা ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়েই শিখে থাকি (এবং কলেজেও এ শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটে) যে, অশোক ছিলেন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশে এবং বিদেশে উক্ত ধর্মের প্রচার-কার্যেই তিনি তাঁর সমস্ত রাজশক্তি ও রাজকোষকে নিযুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার আদর্শ রাজা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুটি উক্তি যে পরস্পরবিরোধী একথা একবারও আমাদের মনে হয় না। আদর্শ রাজার কর্তব্য হলো সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার করা। কেন না এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতার অত্যাজ্য অঙ্গ। আর, কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর। অশোক যদি বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করতে চেষ্টিত হয়ে থাকেন-তাহলে বলতে হবে তিনি ভারতীয় ন্যায়পরায়ণ রাজার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বের যুগে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলেই এত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বহু রক্তপাত এবং দুঃখকষ্টের পর রাষ্ট্র যখন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি অপক্ষপাতে সমভাব অবলম্বন করল তখনই ইউরোপে ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হলো। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের একান্ত অভাব। গাজী, শহীদ বা martyr-এর আদর্শ দ্বারা ভারতবর্ষ কখনও অনুপ্রাণিত হয় নি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমব্যবহারই ছিল ভারতীয় রাজার আদর্শ। সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ গুপ্তসম্রাটগণ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁদের আমলে উক্ত ধর্ম কখনও রাজকীয় ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম রূপে গণ্য হয়ে বিশেষ প্রাধান্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি। ফলে শৈব, সৌর, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণ তথা বদান্যতা

থেকে বঞ্চিত হয় নি। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সৌর, তাঁর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন ও ভগিনী রাজ্যশ্রী ছিলেন বৌদ্ধ, আর হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন শৈব অথচ বুদ্ধ এবং সূর্য-উপাসনাও করতেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পালরাজারা নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবোপাসনার এবং এমন কি বৈদিক যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের পরেই যাঁর নাম সেই কুষাণসম্রাট কণিষ্কের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিও বুদ্ধ, শিব, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বহু দেশী এবং বিদেশী দেবতাগণের প্রতি অপক্ষপাতে সমান সম্মান দেখাতেন। এক্ষেত্রে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষীয় রাজাদের অপক্ষপাতের চিরন্তন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্তভাবে ঝুঁকে পড়লেন এবং উক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারকেই জীবনের ব্রত করে তুললেন, একথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই অনিচ্ছা হয়। অতএব অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীতে কতখানি সত্য আছে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে ঔরঙ্গজীব ও আকবর, ভারতবর্ষের এই দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অবলম্বিত নীতির তুলনামূলক আলোচনা করা অসংগত হবে না। তাতে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হবে বলেই মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাবে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী মহাসাম্রাজ্যের প্রথম অধীশ্বর হচ্ছেন অশোক এবং শেষ অধীশ্বর হচ্ছেন ঔরঙ্গজীব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের এই দুইজন মহাসম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। সিংহাসন লাভের জন্য দুজনকেই গৃহযুদ্ধে ও ভ্রাতৃনিধনে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং উভয়েরই রাজ্যাভিষেক হয় সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুকাল পরে। উভয়েরই চরিত্রগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বধর্মানুরাগ। উভয়েই নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্যে উভয়েই সমকালীন জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ঔরঙ্গজীবকে তৎকালীন

মুসলমান সম্প্রদায় 'জিন্দাপীর' এবং রাজবেশধারী 'দরবেশ' বলে সম্মান করত। অশোক সত্য সত্যই বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিয়ে ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলেন একথা মনে করার হেতু আছে। সুতরাং একজন ছিলেন রাজবেশী দরবেশ, আর একজন ছিলেন ভিক্ষুবেশী রাজা। অনালস্য ছিল এঁদের চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য, স্বীয় কর্তব্যপালনে এবং রাজকার্য-পরিদর্শনে এঁদের কেউ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তাঁদের চরিত্রগত বৈষম্যও কম গুরুতর নয়। ঔরঙ্গজীব স্বীয় রাজ্যে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অশোক স্বীয় শাসনকালের ইতিহাস না হোক, ঐতিহাসিক উপাদান সমূহকে রাজ্যের সর্বত্র পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তম্ভে চিরস্থায়ীরূপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একজন ছিলেন সর্বপ্রকার শিল্পসৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, আরেকজন ভারতবর্ষের শিল্প-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্তক। একজন স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে আকবরের বুদ্ধি ও বীর্যবলে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন, আরেকজন ঐকান্তিক ধর্মানুরক্তিবশত সর্বপ্রকার হিংসা তথা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চন্দ্রগুপ্তের স্ববীর্যার্জিত ও সুনীতিশাসিত বিশাল মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা করলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজীব ও অশোকের সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের ধর্মনীতিগত। ঔরঙ্গজীব ইসলাম-ধর্মকে রাজধর্মের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আদর্শ অনুসারে মুসলমান হিসাবে তাঁর যা কর্তব্য তাই ছিল মুখ্য এবং রাজকর্তব্য ছিল গৌণ। সুতরাং তাঁর জীবনে যখন ইসলামধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলো তখন তিনি স্বধর্মনিষ্ঠার কাছে প্রজা-বাৎসল্যকে বলি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি যদি এদেশে নিছক ধর্মপ্রচারক দরবেশরূপে জীবনযাপন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে অসামান্য সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করতে পারতেন। কিংবা তিনি যদি কোনো ইসলামধর্মাবলম্বী দেশে রাজত্ব করতেন তাহলে হয়তো আদর্শ রাজা বলে গণ্য হতেন। কিন্তু

ভারতবর্ষের স্থায় অমুসলমানপ্রধান দেশের রাজমুকুট শিরে ধারণ করতেই তাঁর জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই ঔরঙ্গজীবের তথা মোগল সাম্রাজ্যের ও ভারতীয় ইতিহাসের ট্র্যাজেডি।

অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ঔরঙ্গজীবের স্থায় স্বীয় ব্যক্তিগত ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করতে কখনো প্রয়াসী হন নি। সুতরাং তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধঘটিত ট্র্যাজেডি দেখা দেয় নি। তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক রেখে তাঁর রাজকীয় কর্তব্যতালিকায় প্রজা বাৎসল্যকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন। তা যদি না হতো তাহলে তৎকালীন অবৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে প্রচারলিপ্সু বৌদ্ধসম্রাট অশোকের জীবনও ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হতো।

পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ধরে বিচার করলে শেরশাহ, শিবাজী, কাশ্মীররাজ জৈনুল্ আবিদিন (১৪১৭-৬৭) এবং বিশেষভাবে আকবরের সঙ্গেই অশোকের তুলনা করা সমীচীন। জৈনুল্ আবিদিনের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আকবরের পূর্ববর্তী হলেও ধর্মনীতিগত উদারতা ও বিচক্ষণতায় তিনি আকবরের চেয়ে কিছুমাত্র হীন ছিলেন না। যা হোক এস্থলে আমরা পূর্বোক্ত তিনজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে আকবরের সঙ্গে অশোকের তুলনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করব। কেননা আমাদের পক্ষে সেইটাই অধিকতর ঔৎসুক্যের বিষয় ও শিক্ষাপ্রদ।

বস্তুত স্বধর্মনিষ্ঠ ঔরঙ্গজীবের চেয়ে সর্বধর্মনিষ্ঠ আকবরের সঙ্গেই অশোকের সাদৃশ্য অনেক বেশি। সমরনিপুণ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভাবক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই আকবরের সঙ্গে অধিকতর তুলনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অনালস্য বা শ্রমশীলতা, ইতিহাস রচনা ও শিল্পসৃষ্টির আগ্রহ, আন্তরিক প্রজাবাৎসল্য এবং বিশেষভাবে ধর্মনীতিগত উদারতায় হিসাবে অশোক ও আকবরের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের "আত্মপাষণ্ড পূজা" ও "পরপাষণ্ডগর্হা"-বিষয়ক নীতি এবং আকবরের অনুসৃত

"সুলহ্-ই-কুল" (সর্বধর্মসহিষ্ণুতা) নীতি মূলত এক। ঔরঙ্গজীবের "দারুল্-ইসলাম" (অর্থাৎ ইসলামরাজ) নীতি অশোক ও আকবর উভয়েরই আদর্শবিরোধী। অশোকের "সমবায়ো এব সাধু" এই গুরুত্বময় উক্তিটি আকবরের "ইবাদৎখানা"র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবরের ইবাদৎখানায় (উপাসনাগৃহে) হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতগণ একত্র সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। তাতে প্রত্যেক ধর্মের লোকের পক্ষেই 'বহুশ্রুত' হয়ে অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সহজ হবে, এই ছিল আকবরের অন্যতম অভিপ্রায়। অশোককথিত সমবায়ের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক এইরূপেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করা। বহু ধর্মের সংস্পর্শে এসে আকবরের মনে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এবং তারই উপর জোর দিয়ে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ঐক্যস্থাপন করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই "দীন ইলাহী" নামক নবধর্মের পরিকল্পনা হয়। অশোকও পুনঃপুন সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আকবরের ন্যায় তিনি এই সারধর্মকে কোনো নবধর্মের আকার দিতে প্রয়াসী হন নি। পক্ষান্তরে তিনি তাকে স্পষ্টতই "পোরাণা পকিতী" অর্থাৎ চিরন্তন ধর্মনীতি বলেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া আকবরের দীন ইলাহী অশোক-প্রশংসিত ধর্মের ন্যায় নিছক চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং তাতে অনুষ্ঠানাদিরও স্থান ছিল। কিন্তু অশোকের ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার স্থান নেই। বরং তিনি নিরর্থক অনুষ্ঠানের ('মঙ্গল') অপ্রশংসাই করেছেন। সর্বশেষ কথা এই যে, ধর্মসমবায়নীতির সাহায্যে সর্বসম্প্রদায় তথা সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার এই যে অপূর্ব সাধনা, তা অশোক এবং আকবর উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। সে ব্যর্থতা শুধু অশোক ও আকবরের পক্ষে নয়, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

'ধর্মবিজয়ী অশোক'

সাহিত্যে সমস্যা

কাজী আবদুল ওদুদ

এমার্সন বলেছেন, মহামানব এমন সমস্ত কথার অবতারণা করেন যে-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবার ক্ষমতাও তাঁর যুগের লোকের নেই। যথেষ্ট ভাববার বিষয় আছে তাঁর এই উক্তিতে। এর এক বর্ণও কি মিথ্যা? দূরে যাবার দরকার করে না, বাংলার কাব্যে ও ছন্দে মধুসূদন যে সমাধান করে গেলেন তাঁর যুগের ক'জন বাঙালী তার সম্ভাব্যতাও কল্পনা করতে পেরেছিলেন?—তেম্‌নি করে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-মাতৃকার পূজা, নির্জীব বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক বাঙালীর জীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্পচাতুর্য, এ সমস্তের কতটুকু আমরা, তাঁদের দেশবাসী, আজও বুঝে উঠ্‌তে পেরেছি? ফেরদৌসীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে একজন উর্দু সাহিত্যিক চমৎকার বলেছেন—ফার্‌সী ছিল শিশু, আধো আধো তার বোল, পলকে সেই হয়ে উঠ্‌ল জওয়ান। আর সে জওয়ানীও যে-সে জওয়ানী নয়—রোস্তমের পাহলোয়ানীর যোগ্য!

এই যে বিশেষ-ক্ষমতা-সমন্বিত প্রতিভা, মূককে যা বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, তা কখন, আর কেন, বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিতরে আবির্ভূত হয়, আজও আমরা বল্‌তে বাধ্য, তার সব কারণ আমরা জানি নে। ইতিহাসে মোটের উপর দেখ্‌তে পাই এর কার্য; আর অনেক সময়ে দেখা যায়, যে-মূর্তিতে প্রতিভা নরসমাজে আবির্ভূত হলো তা কতকটা অপ্রত্যাশিত, অথবা অবাঞ্ছিত। ইহুদীরা প্রতীক্ষা করছিলেন এক প্রতি-বিধিৎসু পরিত্রাতার আগমন, এলেন সেখানে প্রেমমূর্তি যীশু। পৌত্তলিক নৃশংস আরব-সমাজে একেশ্বর তত্ত্ব যে একেবারে অবিদিত ছিল, তা নয়; কিন্তু যে অমিত-তেজসম্পন্ন একেশ্বরবাদ আর নৈতিক জীবনের আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহম্মদ, সাধারণ আরবীর পক্ষে তা এতই অবাঞ্ছিত যে

ব্যক্তিগতভাবে অকথ্য অত্যাচার সারাজীবন তাঁকে তো সহ্য করতে হয়েছেই,. তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জ্ঞাতি কোরেশকুলের অধিকাংশ ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত সে তত্ত্ব বুঝেই উঠতে পারে নি।

এঁদের তুলনায় সাহিত্য রথীদের শক্তি কিছু হীনপ্রভ মনে হতে পারে কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায়, সমস্ত রকমের প্রতিভাই এক গোত্রের,— "অঘটনঘটনপটীয়সী" এই তার চিরকালের বিশেষণ।

এ-হেন শক্তির যিনি অধিকারী, সামান্য-মস্তিষ্ক-সমন্বিত পাণ্ডিত্যাভিমানীর তাঁরই গতিপথ নির্দেশ করবার, নিয়ন্ত্রিত করবার, যে দুরাশা, তাকে স্পর্ধা ভিন্ন আর কোনো ভদ্র নামে অভিহিত করা যায় না। অলঙ্কার আর ব্যাকরণসূত্রের জঞ্জাল জমিয়ে সাহিত্যরথীর গতিপথে বিঘ্ন উৎপাদন যে হাস্যকর, আজকাল একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এখন আমাদের মনের প্রধান মোহ—প্রচলিত নীতিরুচির মোহ,—সংস্কারের মোহ। বলছি না, আমাদের যে-সমস্ত সংস্কার তা অর্থহীন, কেবলই মিথ্যা! তবে আমাদের সংস্কারের বাইরেও যে অনেক কিছু সুন্দর, অনেক কিছু মঙ্গলকর থাকতে পারে সে খেয়াল আমাদের নেই বা থাকলেও তা নির্জীব, অকর্মণ্য। তাই বলছি আমাদের এ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা।

এক জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তির এই কথাকে মহামূল্য বলেই মানি—A healthy nature cannot be immoral—স্বাস্থ্যবন্ত প্রকৃতি নীতিবোধহীন হতে পারে না। প্রতিভার ভিতরে এই স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, এর মগ্নচৈতন্যে সত্য-শিব-সুন্দরের এক চমৎকার সমন্বয় আপনা থেকে হয় বলেই এর এই স্বাস্থ্য আর শক্তি। তাই প্রতিভার হাতে ধ্বংস খুবই হয়; প্রলয়ও সে ঘটায়; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে আসছে—সেই ধ্বংস আর প্রলয়েরই স্তরে স্তরে বিরাজমান মঙ্গল। সীতা-সাবিত্রীর বা এ কালের সূর্যমুখীর আসনে আজ যদি উপবিষ্ট দেখি দামিনীকে, রাজলক্ষ্মীকে, তার জন্য অস্বস্তি-আফসোসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, কেন না এ সমস্ত এক 'নবপর্যায়ের মঙ্গলমূর্তি—নব নব পথে প্রবহমান জীবনের নব নব আবিষ্কার।

কথা হতে পারে, প্রতিভাবান যা দেবেন তা কি কেবলই যুক্তকরে অবনত-

মতকে গ্রহণ করতে হবে ? মনে যার প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না ? প্রতিবাদ করবে না ?—নিশ্চয়ই করবে। কোনো বিশেষ প্রতিভাবান যা দিলেন তাই যে সত্যের একমাত্র রূপ এত বড় স্পর্ধার কথা কি কেউ বলতে পারে ? প্রতিবাদও অনেক সময়ে এক নব পর্যায়ের সৃষ্টির পূর্বাভাস। এখানে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাচ্ছি যে, শক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমরা না হারাই। তাঁর কথায় অর্থ আছে, সৃষ্টিতে নব মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, মানুষের চিরনবীনতার তিনি এক নূতন প্রমাণ—একথা যেন আমরা না ভুলি।

বাস্তবিক প্রতিভার সৃষ্টিতে যে অপূর্বতা, তা ভাবলে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না,—চিরকালই মানুষ এতে চমৎকৃত হয়ে এসেছে। আর তার এমনি প্রভাব যে প্রচলিত নীতিরুচির মায়াকান্না তার সামনে যেন বেত্রাহত হয়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভিক্টর হুগোর 'জিন ভালজিনে'র সামনে নায়ক সম্পর্কে "সদ্বংশ ক্ষত্রিয় ধীরোদাত্ত" প্রভৃতি কথার সংকীর্ণ অর্থ চিরদিনের জন্য হেঁটমাথা হ'য়ে যায় নি কি ?

প্রতিভাবানের সৃষ্টির উপকরণও যে কোথা থেকে কি উপায়ে সংগৃহীত হয় সে-ব্যাপারটিও কম বিস্ময়কর নয়। পুরোপুরিই তিনি দেশকালের সন্তান; কিন্তু সে-দেশ শুধু তাঁর স্বদেশই নয়, আর সে'কাল শুধু তাঁর সমসাময়িক কালই নয়। রামমোহনের দেশ বঙ্গের এক প্রান্ত, আর কাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। অথচ তাঁর দেশবাসী হারির মা পারীর মা বড়াই বুড়ি রামনাথ তর্কপঞ্চাননই নয়; আর তাঁর মনোধর্মের বিশিষ্টতার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর মত বৈদিক যুগ, উপনিষদ-যুগ আর মোতাজেলাদের যুগও তাঁর পক্ষে জীবন্ত। গুরু বা মনীষী-পারম্পর্যও প্রতিভাবানের পক্ষে বন্ধন নয়। বঙ্গসাহিত্যের আসরে নবীনচন্দ্রের সহজ তুম্‌তানানানা শেষ হতে না হতেই কে আশা করেছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠবে এমন অপরূপ তাল-মান-সমন্বিত গীতঝঙ্কার।

প্রতিভাবান যে infallible নন, অসম্পূর্ণতা ত্রুটি তাঁতেও আছে, তার ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে শক্তিমান, সত্যের এক চমৎকার রূপ উপলব্ধি করা যায় তাঁর ভিতরে, এইটিই আসল গণনার বিষয়। সেই পরম

কৌতুকীর এ এক চমৎকার কৌতুক যে অক্ষম অথচ দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে তিনি বাঁদর নাচের তামাসা দেখছেন। শক্তিমানের নাকেও যে সময় সময় সে দড়ি না ওঠে তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কি দরকার আছে? মানুষের অধিনায়কত্বে, বিশেষ করে সাহিত্যে, কোনোদিন অনধিকারীর আসন লাভ ঘটে না, জয়পত্র. ললাটে বেঁধে যিনি মানুষের সামনে দেখা দিলেন স্বয়ং বিধাতার দেওয়া সেই জয়পত্র—এ সব আমরা জানি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এই মোটা কথাটাও জানি যে, সেই জয়পত্রের মেয়াদের কম-বেশ আছে।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল গাচ্ছেন—"চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" জীবনে, সাহিত্যে, সত্যকার সমস্যা যদি কোথাও থাকে তবে সে এই গতির সমস্যা—পর্যাপ্ত জীবনানন্দ আর অপ্রতিহত চলার বেগের সমস্যা। বলা যেতে পারে, এই গতির অভিমুখেই তো Idealism Realism-এর সমস্যা, জাতীয়তা সর্বজনীনতা সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বয় ইত্যাদির আলোচনা। কিন্তু এ বৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে শুধু কুয়োর জল টেনে টেনে সমস্ত দেশকে সজীব রাখবার চেষ্টা, তাই চিরকাল বর্ষণধর্মী স্রষ্টাদের কাছে হাসি-তামাসার ব্যাপার।

বাস্তবিক বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট হয়ে যায় নি, অতীত সংস্কারের জুজুর ভয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যেখানে ক্ষীণ কাহিল হয়ে পড়ে নি, সমস্যা নিয়ে কোনো সমস্যাই যেখানে নেই, নানা সমস্যার আলোচনা সেখানে চলতে পারে। কিন্তু সে-সব খেয়ালের নামান্তর।

'শাশ্বত বঙ্গ'

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

প্রমথনাথ বিশী

বিধাতার বেরসিক বলিয়া অপবাদ আছে যে, তিনি অনেক সময়েই মাটির ভাণ্ডে অমৃত রাখেন, লোকে সন্দেহই করিতে পারে না যে, এইরূপ অকিঞ্চিৎ-কর পাত্রে স্বর্গীয় সুধা রহিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে নাই। শচীর মণিমাণিক্যজড়িত পানপাত্রে স্বর্গের অমৃত স্থান পাইয়াছে।

বিধাতা যে শিলাখণ্ড দিয়া রামায়ণ-মহাভারতের যুগের বীর ও মনীষীদের গড়িয়াছিলেন, তাহারই খানিক যেন তাঁহার শিল্পশালার একান্তে পড়িয়া ছিল; বহু যুগ পরে বিধাতাপুরুষ তাহা দিয়া রবীন্দ্রনাথকে গড়িয়াছেন। তাঁহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ আর তাঁহার জন্মমুহূর্তে প্রত্যেক দেবতা আপনার ডালি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন এই নবজাত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ভাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারই সুপুরুষের পরিবার; তাঁহার ভাইদের মধ্যে তিনিই রূপে নাকি ছিলেন কিঞ্চিৎ নিরেস, আর তাঁহার রঙই নাকি ছিল সকলের চেয়ে কালো। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের সহোদরদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমি দেখিয়াছি; তাঁহাদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের যখন দেখিয়াছি তখন তাঁহাদের বয়স বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও তো বেশি বয়সেই দেখিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কী, বেশি বয়সেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য যেন পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৃহৎ একটা অংশ ছিল প্রতিভার জ্যোতি। মানুষের মুখে প্রতিভার এমন দীপ্তি যে থাকিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে হয়তো বিশ্বাস করিতাম না। প্রাচীন চিত্রে মহাপুরুষদের মুখের চারিদিকে একটা

জ্যোতির্ময় গোলক অঙ্কিত দেখা যায়; সেই গোলক প্রতিভার দীপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মহাকবি যখন প্রতিভাভাস্বর মূর্তি লইয়া, প্রাচীন হস্তিদন্তাভ অঙ্গচ্ছটায় শিথিলস্নিগ্ধ পোশাকের বদান্যতার রাজকীয়-মহিমায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি ও বিস্ময় উদ্রিক্ত হইত; মনে হইত দেবরাজ যেন কৌতুক ও কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন। দেবরাজই বটে! বিদ্যুৎ বজ্র-ও বর্ষণের সমস্ত রহস্যই তাঁহার করায়ত্ত! বিস্মিত দর্শকের ভাব দেখিয়া যুগপৎ তাঁহার ওষ্ঠাধরে কৌতুকস্মিত ও অপরাজিতার মত চোখে স্নেহের ভাব জাগিয়া উঠিত। 'মানুষে এমন গুণ কভু না দেখিএ।'

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পোশাকে বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ লোকের ব্যক্তিত্ব যেমন বৈশিষ্ট্যবর্জিত, তাহাদের পোশাকও তেমনি; তাহাতে প্রয়োজনের ছাপমাত্র আছে, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের সাজ-সজ্জায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইত, কিংবা তাঁহার সজ্জা তাঁহার ব্যক্তিত্বেরই প্রক্ষেপ।

সাধারণত তিনি পায়জামা ও ঢিলে জামা পরিতেন; উৎসবাদি উপলক্ষ্যে গরদের ধুতি চাদর পাঞ্জাবি; আর, বিদেশ ভ্রমণে তাঁহার মাথার উঁচু টুপি এখন বিশ্ববিখ্যাত। ইহা তো কেবল স্থূলভাবে বলা হইল; যেরকম পোশাকই তিনি পরুন-না কেন তাহাতেই তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। প্রসাধনের রহস্য এই যে, বেশভূষা যেন মানুষকে ছাপাইয়া না যায়। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটে, পোশাকটাই লক্ষ্য হইয়া উঠে, মানুষটাকে আর চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যত সুন্দর পোশাকই পরুন-না কেন, তিনি সর্বদা লক্ষ্য-গোচর থাকিতেন। এক স্থানে তিনি পোশাককে 'দেহগানের তান' বলিয়াছেন। তাঁহার গানে কথাকে ছাপাইয়া তান যেমন উৎকট হইয়া উঠিতে পায় না, তেমনি এই 'দেহগানের তান' তাঁহার মূর্তির চেয়ে কখনো প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

একদিনের কথা মনে আছে। তখন আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষের দিকে; আকাশ নূতন বর্ষার মেঘে ঘননীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনো গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের একটি বাংলাতে। আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন; সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুন্‌গুন্ করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন: ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীলপদ্ম লাগি! ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিনুবাবু তখন থাকিতেন দেহলিবাড়িতে। পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যেটুকু সময় বেশি লাগিবে, সেটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো সুরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

তাঁহার গায়ে ছিল লম্বা বর্ষাতি; তাহাতে জল ঝরিতেছে; হাতে ছাতিটা বন্ধ; হয়তো পথে খুলিয়াছিলেন, কিন্তু গাছের ডালপালায় বাধিয়া গিয়াছিল, তাই বন্ধ করিয়াছেন; কিম্বা হয়তো খুলিবার কথা আদৌ মনে হয় নাই। ফলকথা তাঁহার এমন মত্ত ভাব আর কখনো দেখি নাই। উদাসীন দৃষ্টি সেই নিভৃত নীল পদ্মের দিকে বদ্ধ, দেহটা অভ্যাসের বশে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কাব্যে মত্ত গজরাজের পদ্মবন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি; এতদিন এই চিত্রটাকে কবিদের একটা কৃত্রিম অলংকারমাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নর-শ্রেষ্ঠের এই ত্বরিত গতি দেখিয়া আমার মনে ওই উপমাটা এক মুহূর্তে নূতন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি সেদিন জল-ঝরা বর্ষাতির আবরণে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল। সবসুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব!

এখনকার উত্তরায়ণের বৃহৎ প্রাসাদ তখন তৈয়ারি হয় নাই; উত্তর দিকে

দুখানি ছোট কোঠাঘর মাত্র ছিল। তাহারই একখানিতে রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন।

সে একটি অদ্ভুত বাড়ি। বাড়িটিতে পাঁচ-সাতটি ছোট-বড় কক্ষ; কোনোটির ছাদ অপরটির সঙ্গে সমতল নয়। উঁচু, নিচু, আরও উঁচু, আরও নিচু ছাদের বিচিত্র সমবায়। উপরে উঠিবার সিঁড়ি নাই—একছাদ হইতে উচ্চতরটিতে অনায়াসে ওঠা যায়। ঘরের দরজা জানালা বলিয়াও বিশেষ কিছু নাই; সবই দরজা, সবই জানলা; দেয়ালের চেয়ে ফাঁকের অংশই বেশি; চারিদিকে ছোট-বড় নানা মাপের বারান্দা। ঘরে আসবাবপত্রও বিরল; খানকয়েক চেয়ার ও অনেকগুলি মোড়া মাত্র; মাঝখানকার বিস্তৃততর ঘরটাতে আগাগোড়া শতরঞ্চি পাতা, শতরঞ্চির উপরে চাদর; তাহার একদিকে কবি বসেন, চারিদিকে শ্রোতার দল। ঘরের চারিদিকে নানা জাতের গাছ কতক বা বুনো, কতক সযত্নরোপিত। পশ্চিমদিকে লজ্জাবতী ও কণ্টিকারির ক্ষেত; পুবে উত্তরে নিমলেবু আর ঝুমকো ফুলের লতা: কাঁকর-ঢালা পথের দুই ধারে সার বাঁধা বেলফুলের চারা।

পুবের বারান্দায় চায়ের টেবিল। চায়ের সরঞ্জাম সরাইয়া লইবার পরেও তিনি সেখানেই বসিয়া থাকিতেন। একে একে শ্রোতার দল আসিয়া পড়িলে বারান্দার মোড়াগুলি ভরিয়া যাইত।

হয়তো কলিকাতা হইতে দু'একজন অনুরাগী আসিয়াছেন, প্রশান্তবাবু ও রামানন্দবাবু। অদূরবর্তী বাড়ি হইতে পুবদিকের মাঠ ভাঙিয়া দিনুবাবু পাল-তোলা প্রকাণ্ড বজরার মত দ্রুত চলিয়া আসিতেছেন; পুব-দক্ষিণ কোণ হইতে সন্তোষবাবু ও তেজেশবাবু ধীরে ধীরে আসিলেন; সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া উত্তর দিক হইতে ক্ষিতিমোহনবাবুর আগমন; সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; নেপালবাবুর দীর্ঘসূত্রিতা সর্বজনজ্ঞাত,তিনি বেলা তিনটায় উত্তরায়ণ বলিয়া রওনা হইয়াছিলেন, পথে বহুলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বহু আলাপ করিতে করিতে সকলের শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উত্তরায়ণে আসিয়া পৌঁছিলেন। নেপালবাবু আসিলে বুঝিতে পারা গেল সভা আরম্ভের

সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। ততক্ষণে মোড়ার আর একটিও খালি নাই। লেখক প্রভৃতির মত বয়স যাহাদের অল্প, যাহাদের খুচরা বলিয়া ধরা হয়, তাহারা এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া জটলা করিতে লাগিল। নন্দলালবাবু কখন সকলের অগোচরে আসিয়া পিছনে বসিয়াছেন।

বারান্দায় বসিয়া থাকার সময়ে প্রধানত সাময়িক প্রসঙ্গ ও দেশের খবরাখবর আলোচনা হয়। কবির প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দবাবু নিজের মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে নেপালবাবু আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়া ওঠেন, "সকলেই আপনার অপেক্ষা করছিলেন, নেপালবাবু।" নেপালবাবু সপ্রতিভভাবে বলিয়া ওঠেন, "আজ তো আমার দেরি হয় নি, অনেকক্ষণ রওনা হয়েছি।" সকলেই হাসিয়া ওঠেন, নেপালবাবুও হাসিতে থাকেন।

তখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এবারে ভিতরে যাওয়া যেতে পারে।" ততক্ষণে শীতও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার আগেই শাস্ত্রীমহাশয় "সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হইয়াছে" বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

সকলে ভিতরে গিয়া বসেন। রবীন্দ্রনাথ একদিকে, অন্যদিকে সকলে ঠাসাঠাসি করিয়া। তিনি বলেন, "এদিকে এগিয়ে বসুন-না।" কিন্তু, তাঁহার দিকে কেহ অগ্রসর হইতে চাহেন না। ঘরের অপর প্রান্তে কয়েকজন মহিলাও বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ। তখন ক্ষিতিমোহনবাবু সাহসে ভর করিয়া বলেন, "নূতন কবিতা কিছু আছে কি?"

"আছে, তবে আপনাদের কেমন লাগবে জানি না।" এই বলিয়া তিনি বাঁধানো খাতাখানি লইয়া বার কয়েক পাতা উল্টাইয়া কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন:

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল 'আহা আহা'
সকল বনভূমি?

সেটি শেষ হইলে আবার নূতন একটি আরম্ভ করেন :

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র কাছে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎ-স্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।

পাঠ শেষ হইলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের বাতাস থম্‌থম্‌ করিতে থাকে, কেহ কথা বলে না। শেষে রবীন্দ্রনাথই আরম্ভ করেন, হয়তো কবিতা দুটির অনুপ্রেরণার অভিজ্ঞতা, হয়তো তৎসংক্রান্ত আরও কিছু। এক কোণে বসিয়া সন্তোষবাবু খাতায় তাহা টুকিয়া লন।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তার স্রোত মন্দ হইয়া আসে। তখন হয়তো রামানন্দ বাবু বলেন, "নূতন কোনো গান?"

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দিনু, এবার তোর পালা। বুঝলেন রামানন্দবাবু? এখন আমার গানের রাজ্যে শীতের পালা চলছে।"

দিনুবাবু এক কোণে বসিয়া ছিলেন, সেখান হইতে মাথা নিচু করিয়া গান ধরেন :

শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই ফুরোলো,
আমার শীতের বনে এলে যে—

দিনুবাবুর সুরের ইন্দ্রজালে ঘর ছাপাইয়া যায়, সুর মাঠের মধ্যে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

গান শেষ হইলে শ্রোতারা একে একে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়ে। সবাই চলিয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় চেয়ারটিতে আবার গিয়া বসেন—কতক্ষণ বসিয়া থাকেন কে জানে। মৌন প্রকৃতির সঙ্গে একক কবির কী নীরব বাণী-বিনিময় হইতে থাকে কে বলিতে পারে।

এক-একদিন রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য আসর রীতিমত অভিনয়মঞ্চে পরিণত হয়। মাঝখানটার হলটাতে, সেটাকে রঙ্গমঞ্চও বলিতে পারা যায়, অভিনয়ের ক্ষেত্র। আলোতে আল্পনায়, ফুলে পল্লবে, সাজসজ্জায় সবসুদ্ধ ঝল্‌মল্‌ করে। দর্শকেরা

বারান্দায় বসে, নীচের জমিতে চৌকির উপরে বসে। রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের নীচেই উপবিষ্ট। তার পরে ইঙ্গিতমাত্রে আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, মণিপুরী বাদকের খোল-করতাল উত্তাল হয়, তানপুরা এস্রাজ ঝংকার দিয়া ওঠে—আর অমনি নেপথ্য হইতে সুসজ্জিতা বালিকারা রঙের বন্যার মত নাচের তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে:

নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি,
আমার মন কয় 'চিনি চিনি।'

তখন গানে নাচে আলোতে বাদ্যে সব একাকার হইয়া গিয়া একটিমাত্র শিল্পের অপরূপ ইন্দ্রধনুতে পরিণত হয়। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের পাঁচ আঙুলে দর্শকের চিত্তে টান পড়ে—সেই রসজাহ্নবীতে তাহাদের আপাদমস্তক অভিষিক্ত হইতে থাকে।

পারুল শুধাইল, কে তুমি গো
অজানা কাননের মায়ামৃগ।

বালিকারা লতায়িত দেহভঙ্গীতে গানের পর্দার উপরে লাস্যের ফুল তুলিতে তুলিতে নাচিতে থাকে।

কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবন এলো চুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি।

সমে আসিয়া খোল-করতাল তানপুরা এসরাজ সুর ও লাস্য উদ্দাম হইয়া ওঠে। আর তার সঙ্গে মেশে লেবুফুল ও ঝুমকো লতার সৌরভ, নিমফুল ও শিরীষের সৌগন্ধ্য। মানুষ ও প্রকৃতির ঐকতানে দর্শকেরা স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে থাকে—এ কি বাংলা দেশ না উজ্জয়িনী?[১] মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় রজনীতেও কবিসম্রাটের রাজধানীতে কি এমনি অলৌকিক উৎসব-সমারোহ পড়িয়া যায় নাই?

[১] 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'

যুগজিজ্ঞাসা

অন্নদাশঙ্কর রায়

খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "খুকু, তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো? মাকে, না বাবাকে?"

খুকু কী উত্তর দিল জানেন? "মাকেও, বাবাকেও।"

তেমনি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কাকে বেশী ভালোবাসো? দেশকে, না যুগকে? আমি উত্তর দেব, "যুগকেও, দেশকেও।"

দেশ এতদিন পরাধীন ছিল বলে আমরা দিন রাত দেশের কথাই ভেবেছি, যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি, যখনি কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে তখনি আধুনিককে পাশ্চাত্ত্য বলে এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার। ঐ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে।

গত শতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেননি। কিন্তু ঐ শতাব্দীরই শেষ ভাগে উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। দেশানুরাগ হয়ে দাঁড়াল দেশের অতীতানুরাগ, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব এর একটাকে বরণ করতে গেলে অপরটাকে উপেক্ষা করতে হবেই, মাঝখানে সেতুবন্ধনের আশা দুরাশা। অথচ এমনি আমাদের পরাধীনতার জ্বালা যে আমরা ইংরেজ মনে করে ইউরোপকে বর্জন করব; ইউরোপ মনে করে আধুনিক যুগটাকে অগ্রাহ্য করব, থাকব কাকে নিয়ে? না, ভারতের অতীতকে।

ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তার থেকে এল সেতুবন্ধনের কথা। প্রাচীন ভারতও থাকুক, আধুনিক বিশ্বও থাকুক, মাঝখানে একটা সেতু নির্মাণ

করা হোক। সমন্বয়। তার মানে গোঁজামিল। অতীত সম্বন্ধে কারই বা সম্যক ধারণা আছে যে দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে বলতে পারবে এই হলো সেতুর এক প্রান্ত! প্রাচীন ভারতে যেমন দেবতা ছিল তেমনি দানব ছিল, যেমন মানুষ ছিল তেমনি রাক্ষস ছিল, যেমন পাণ্ডব ছিল তেমনি কৌরব ছিল, যেমন অহিংসা ছিল তেমনি অতি ভয়ংকর ভয়ংকর মারণাস্ত্র ছিল, যেমন আস্তিক দর্শন ছিল তেমনি নাস্তিক দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাকে এক কথায় আধিভৌতিক বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায় না, প্রাচীন ভারতকেও এককথায় আধ্যাত্মিক বলে আকাশে তুলে দেওয়া যায় না, আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

এই পণ্ডশ্রমের পশ্চাতে ছিল পরাধীনতাবোধ। এখন তো সে বোধ নেই। এখন পণ্ডিতদের বলা উচিত, আর পণ্ডশ্রম করতে হবে না, পুরোপুরি আধুনিক যুগের সঙ্গে অভিন্ন হও। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অপরের মধ্যে যতটা দেখছ তোমাদের মধ্যেও ততটা থাকবে। প্রাচীন ভারত তার আয়ু নিঃশেষে ভোগ করেছে, তোমাদেরটাও যেন গ্রাস না করে।

আর এই যে আধুনিক যুগ, ইউরোপ বা আমেরিকা এর একমাত্র শরিক নয়। তোমরাও শরিকান। তোমরা এক হাতে নেবে, আর-এক হাতে দেবে, তোমাদেরও একটা ভূমিকা আছে, তোমরা তাতে অভিনয় করবে, কিন্তু খবরদার, সেটা হ্যামলেটের ভূতের পার্ট নয়। তোমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নও। তোমরা আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। তোমাদের ভূমিকা পূর্ব-নির্দিষ্ট নয়, তা সৃষ্টিশীল, তা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলবে। থাকবে তার মধ্যে তোমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ সাধছে না তোমাদের মার্কিন বা রুশ হতে। কিন্তু আধুনিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা চাই।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ একথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউমানিজম, তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনে মানুষের চেয়ে মানুষের সমাজ ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। নারীকে, শূদ্রকে, ক্রীতদাসকে নির্মম-ভাবে ছোট করে রাখা হয়েছে, যেন সেটা তাদের দৈবলিখন। দৈবলিখন বলে চালানো হয়েছে যা প্রতিকারযোগ্য, যা প্রতিকার করা সম্ভব, তাকে। সনাতন বলে চালানো হয়েছে যা তৎকালীন তাকে। প্রাকৃতিক বলে চালানো হয়েছে যা কৃত্রিম তাকে। নৈতিক বলে চালানো হয়েছে যা বদ্ধমূল সংস্কার তাকে। সত্য বলে চালানো হয়েছে যা স্বার্থদুষ্ট তাকে।

বিদ্রোহ শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় থেকে। তা বলে বিদ্রোহটা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ওটা সর্বমানবের যেমন ভারতীয়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সর্বমানবের। বিদ্রোহের কেউ এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে পৌছলেও সেটা বন্দরের ঢেউ নয়, সমুদ্রের ঢেউ। বিদ্রোহের হাওয়া এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পৌছলেও সেটা মাটির হাওয়া নয়, আকাশের হাওয়া। বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আধুনিকতম রূপ নিয়েছে। কেউ পড়ে থাকতে চায় না, জাতের দরুন না, রঙের দরুন না, লিঙ্গের দরুন না। অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে। তা সে যুদ্ধ করেই হোক বা বিপ্লব করেই হোক বা আপোসেই হোক বা বন্ধুভাবেই হোক। শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য বন্ধুভাব বা অহিংসা। নিকৃষ্ট উপায় যুদ্ধ। একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর একটা উপায় পরীক্ষা করবেই। উদ্দেশ্য হলো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য কেবল এই নিয়ে আয়ু শেষ করা সকলের কর্তব্য নয়। সৃষ্টির কাজ করে যেতে হবে আমাদের অনেককে। গায়ক গাইবে, বাদক বাজাবে, নর্তক নাচবে, ছবিকার ছবি আঁকবে, কবি কবিতা লিখবে। এসব কাজ একদিনও ফেলে রাখা যায় না। ফেলে রাখলে পরম্পরা কেটে যাবে। সাধনার ধারা

শুকিয়ে যাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এসব প্রক্রিয়া নিত্য বহমান। কেউ যদি বলে, এসব কিছুকালের জন্যে বন্ধ রাখলে ক্ষতি কী, তা হলে বুঝতে হবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরণের লোক সবদেশেই দলপতি হয়ে বসেছে। কোথাও কম কোথাও বেশী।

বন্ধ রাখলে সাধারণের দিক থেকেই আপত্তি ওঠে। তখন এরা বলে এদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে। আর-এক আপদ। এর চেয়ে বন্ধ করা কম খারাপ। শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত। বাঁচা অবশ্য কায়িক অর্থে নয়। সৃষ্টি করতে করতে বাঁচা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই, নইলে আর সব হবে, রস হবে না, রূপ হবে না, সৌন্দর্য হবে না। এ যুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন এর কোনো শিল্পসম্পদ রেখে যাবে না। পরবর্তী যুগের ওরা বলবে এ যুগ নিষ্ফলা, বন্ধ্যা।

সুতরাং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা করতে চাও, করো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রেখ শিল্পীদের বেঁচে থাকা দরকার। শুধু কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। তারা যদি মর্জির মতো করে লিখতে না পারল, আঁকতে না পারল, গাইতে না পারল, নাচতে না পারল তা হলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য! তারা যদি তোমাদের ফরমাসই খাটবে তা হলে তারা শিল্পী হতে যাবে কোন্ দুঃখে! তারা যুগের ভিতর দিয়ে কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা নিত্যকালের রাখাল। অমৃতের সন্তান। যুগ যদি তাদের বিকৃতি ঘটায় সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি। ভাবীকাল তা দেখে হাসবে।

এ যুগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সকলকেই! শিল্পীকেও। কিন্তু শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সেইজন্যে তার সাধনাও যুগকে অতিক্রম করবার মতো দুরূহ। এই দুরূহ নিয়ে যারা আছে তাদের সহজ দিয়ে ভোলানো যায় না। যারা নগদ বিদায় চায় তাদের ধারা আলাদা। তারা আজ-আছে, কাল নেই। কিন্তু যারা আজ আছে, কাল আছে, চিরকাল আছে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে চুপ করে দেখ তারা কী লিখছে, কী আঁকছে,

কী দিচ্ছে। তারা যদি বাঁচে তাদের মধ্যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে।

শিল্পীর দুর্দিন সবদেশেই লক্ষ্য করছি। সেইজন্তে যুগকেই তার জন্তে দায়ী করি। এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না হয় তা হলে আফসোসের সীমা থাকবে না, কারণ এমন বিষয়বস্তু, এত ঘাত প্রতিঘাত, এতরকম চরিত্র, এ পরিমাণ সংস্কারমুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।

প্রবন্ধ'

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

মাছি-মারা-কেরাণি নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, "হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।"

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপশোষ ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত:—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, "সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি!

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধকরি খৈয়াম তার বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরাণের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লাম বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শুনে না। তার মুখে ঐ এক কথা "অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?"

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠা পরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লার্গে—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইএর দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, "বইয়ের দাম কমাও", তবে সে বলে "বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?"

"কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?"

"আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?"

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন; কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে।

সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। সে এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুণ সকালবেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না : লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিক্‌শ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer—আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি। কেউ কেনে না বলে আমিই consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরীখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, "বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?"

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, "ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরীটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।"

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরী গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না

দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিষ গলা কেটে ফেললেও ছোবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক বির্বজিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, "ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবীটা ঠিক, ধনীর, না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণজনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে পশ্য, পশ্য, জ্ঞানর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না।—বই পড়তে পারে না।"

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে, "অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।"

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোক প্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিণী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তার স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, "তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?" গরবিণী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, "সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।" যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। এক-খানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কত গল্প বলবো ? বাঙালীর কি চেতনা হবে ?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞান তৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার। কোন কোন বেশরম বলে, "বাঙালীর পয়সার অভাব।" বটে ? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ থেকে ?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরী ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

'পঞ্চতন্ত্র' (১ম)

বাংলা কাব্যের গোড়ার কথা

হুমায়ুন কবির

বাঙলা চিরদিনই কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যই বাঙালীকে কবি করেনি—তার কবিপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্য-লীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূল ভরে ওঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টী ঋতুর এ বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে ঐশ্বর্য যে বাঙালীর মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি?

কেবলমাত্র ঋতুর লীলা বলে নয়,—বাঙলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাঙলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট, আকটিকণ্ঠ জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তার মালা। পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকরের পথ—দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাষ, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত

অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলাবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সঙ্গে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি: প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?

বাঙলার কাব্যের যে দুইটী প্রধান ধারা, মননরীতি ও প্রকাশভঙ্গীর যে দুইটী প্রধান রূপ, বাঙলার নিসর্গগঠনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার খানিকটা পরিচয় মেলে। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গ গঠন দিয়েই সে বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণ-ভাবে বোঝা যায় না। বাঙালীর জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেও তার অঙ্কুরের সন্ধান রয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার স্থান বা সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু তবু একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই বাঙলার মতন রক্তের মিশ্রণ হয়নি। বাঙলার আদিম অধিবাসী হয় তো নিগ্রয়েড, যদিও এ সম্বন্ধে জোর করে কোন কথা বলা চলে না। সে আদিম রক্তধারা কিন্তু অবিমিশ্র থাকে নি—অতি পুরাতন

কাল থেকেই তার মধ্যে দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। মঙ্গোলীয় মনোবৃত্তির যে অহিংস্রতা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, বাঙালীর স্বভাবে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু বাঙালীর চরিত্রে যে অস্থিরতা ও উন্মাদনার প্রাচুর্য, আদিবাসীর অবিকশিত মনোবৃত্তির আকস্মিক উত্তেজনার উত্তরাধিকার হিসাবেই তাকে সহজে বোঝা যায়। দ্রাবিড় রক্ত বাঙলার কাব্য, সাহিত্য ও সভ্যতায় কি দান এনেছে, সে কথা বলা কঠিন; হয়তো গোষ্ঠিপ্রীতি ও অলস নিষ্ক্রিয়তা দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণেরই ফল। নিষ্ক্রিয়তা তো পর-মত-সহিষ্ণুতা এবং অহিংস্রতারই অন্য পিঠ। তার পরে এসেছে আর্য, কিন্তু বারে বারে আর্য আক্রমণ এবং বিজয় সত্ত্বেও আর্যরক্তের অংশ বাঙালীর মধ্যে অল্প। নিসর্গপ্রীতি আর্যমানসের অঙ্গ, সংগ্রামশীলতা এবং আত্মপ্রত্যয় তার স্বভাব। বাঙলার কাব্যলোকে যে নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতির প্রকাশের মধ্যে লোকাতীতের যে সন্ধান, তাকে আর্যরক্তের দান মনে করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে মোগল রাজত্বের প্রায় অবসান পর্যন্ত বারে বারে যে আর্য অভিযান, বাঙলার কাব্যসৃষ্টিতে তার প্রভাব কম নয়। নানান দিক থেকে বাঙলার মানসকে সংসারমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে বাঙলা সাহিত্যের অপরূপ বিকাশে তা সহায়তা করেছে।

ধর্মের বিপ্লবের মধ্যেও বাঙলার কাব্যরূপ নতুন নতুন উপাদান পেয়েছে. বৌদ্ধবিপ্লব বাঙলা দেশে যেভাবে জাতির মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল, আর কোথাও বোধহয় তার নিদর্শন মেলে না। সে যুগে যাতায়াতের সুবিধা ছিল অল্প, এবং রাস্তাঘাটের অভাবে যে কেবলমাত্র লোক চলাচলের ব্যাঘাত ঘটেছে, তা নয়, ভাবের আদান-প্রদানের ব্যাঘাত ঘটেছে আরো বেশী। আবহাওয়ার দরুণও অভিযাত্রী আর্যেরা সহজে এ সুদূর প্রান্তপ্রদেশে আসেনি, এবং এ সমস্ত কারণ মিলে বাঙলায় যে সামাজিক জীবন ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাতে আর্যপ্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট হলেও গভীর হতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে জনপদে ও নগরে এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সে প্রভাবের পরিসমাপ্তি। সময়ের দিক থেকেও আর্যপ্রভাব বাঙলায় এসেছে সকলের পরে, এবং পশ্চিমের

নতুন নতুন আক্রমণে যখন ভারতের কেন্দ্রে রাষ্ট্রশক্তি ভেঙে পড়েছে, তখন বাঙলা দেশেই কেন্দ্রীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে প্রথম। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার যে সমস্ত পরিবর্তন এবং ধর্মসাধনায় যে সমস্ত বিপ্লব, নতুন নতুন অভিযাত্রীর আগমনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গভীর, এ সন্দেহ অমূলক নয়, কিন্তু এ বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণের অভাব আজো এত বেশী যে জোর করে কোন কথা বলাও কঠিন। তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে বহুদিন পর্যন্ত আর্যাবর্তের অন্যান্য অংশ থেকে বাঙলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সত্তা বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং সেই জন্যই নতুন নতুন ধর্মবিপ্লব বাঙলা দেশে এত সহজে শিকড় মেলেছিল। বৌদ্ধবিপ্লব কেবলমাত্র আচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধির অথবা সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ নয়, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের বিদ্রোহও বটে, এবং ক্ষত্রিয় এ ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত অত্যাচারিত অংশের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হয়েছিল বলেই এ বিদ্রোহের এত বিপুল বিস্তৃতি ও সার্থকতা। আর্যপ্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত অঙ্গ-বঙ্গ-মগধেই তাই এ বিদ্রোহের জয়ও এত ব্যাপক।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলেই এ বিপ্লবী মনোবৃত্তি কেন বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল, তাও সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতির শক্তির উদ্যত আঘাতের সম্মুখে সংগ্রামশীল মন, নদীপ্রবাহের ভাঙাগড়ায় গৃহসৃষ্টির ব্যর্থতাবোধ, এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে পূর্ববঙ্গকে বৌদ্ধমানসের উপযোগী ক্ষেত্র করে রেখেছিল। বাঙলায় আর্যপ্রভাবের শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, পূর্ববঙ্গে সে প্রভাব ক্ষীণতর। বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে স্থিরতা অনেক বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখানে অধিকতর কার্যকর। তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধমানসকে ধ্বংস করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতিবিচারের পুর্বস্মৃতির মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। বল্লালী কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব সেখানে, সবচেয়ে বেশী সাফল্যও বোধহয় সেইখানে। কিন্তু ভঙ্গুর, বিপ্লবী পরিবর্তনশীল পূর্ববঙ্গে জাতিবিচারের পূর্ণপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সে পরিমাণে সার্থক হয়নি। সেই জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বিবাহে ব্যবহারে সেদিন পর্যন্ত নানাবিধ বাধার কথা শোনা যায়।

হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে কৌলীন্য ও জাতিবিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্বদেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচেছিল। মোসলেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দেয়। বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে কোনদিনই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি, রাজ-শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ইসলামের প্রচারের মধ্যে বৌদ্ধ-মানসের ক্রিয়া তাই সুস্পষ্ট—সেইজন্যই এ প্রান্তপ্রদেশে মুসলমানের প্রাচুর্য।

বাঙলার বৌদ্ধবিপ্লব কেবলমাত্র ধর্মবিপ্লব নয়। বাঙলা দেশে এ বিপ্লব উত্তর ভারতীয় আর্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল, সেই বিদ্রোহের মধ্যে পেয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণা। তার ফলে সংস্কৃতের হল পরাজয়, প্রাকৃত ও দেশভাষার দিকে পড়ল ঝোঁক। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সূত্রপাত তারই মধ্যে বাঙলা ভাষারও গোড়াপত্তন সেইখানে। হিন্দু অভ্যুত্থানের প্রাবল্যের যুগে কালপ্রবাহকে ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল, সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বাঙলার মানসকে সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টাও প্রবলতর হল, কিন্তু বিপ্লবী পূর্ববাঙলায় বৌদ্ধমানস জনসাধারণের অবচেতনার মধ্যে মজ্জাগত, সেই প্রচ্ছন্ন চিত্তসংগঠন বদলাতে হলে যতখানি সময়, যতখানি সুযোগ যতখানি সুবিধার প্রয়োজন, বাঙলার হিন্দু অভ্যুত্থান তা পায়নি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাই স্ফুলিঙ্গই রয়ে গেল, দাবানল হয়ে জ্বলে উঠবার অবকাশ পেল না। সংস্কৃত ভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তাই মোসলেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার পরাজিত হল, বাঙালীর চিত্তও প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্রশাসনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। বাঙলার কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রকাশ তাই বৌদ্ধ দোহায়—তারই মধ্যে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঙালীর বিদ্রোহ আপনাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করল।

'বাঙলার কাব্য'

ক্লাইভ্ স্ট্রিটে চাঁদ

বুদ্ধদেব বসু

বাস্‌টা মোড় ঘুরতেই আমি নেমে পড়লুম। কী সহজে লেখা হ'য়ে গেলো কথাটা, যেন সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় ক্লাইভ স্ট্রিটের মোড়ে বাস্ থেকে নামতে কোনো হাঙ্গামাই নেই; যেন অনেক কষ্টে কোঁচা সামলে, অন্যের পা মাড়ানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, ওঠবার জন্য ব্যাকুল ও নামবার জন্য ব্যস্ত ভিড়ের ঠেলা-ঠেলির মধ্যে কোনোরকমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষত রেখে…অনেক চেষ্টায়, দস্তুরমতো জিমনাস্টিক্স ক'রে রাস্তায় পদক্ষেপ করতে হয় না। যা-ই হোক, নেমে তো পড়লুম, এবং অনুমানে বুঝতে পারলুম শরীরটা আস্তই আছে।

সম্মিলিত মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন খারাপ হয়ে যায় অনেক লোক যেখানে একত্র হয়, সেখানে আমি সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে, মানুষের মধ্যে—অন্তত কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে—আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়, যেখানে একই উদ্দেশ্যে— কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়—অনেকে জড়ো হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে; সব মিলে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে। গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি মানব-মাংসের স্তূপ, তা থেকে যেন উঠছে জীবনের তিক্ত গন্ধ, উন্মাদক এবং ঝাঁজালো—তার মধ্যে সহজে যেন নিঃশ্বাস পড়ে না।

ক্লাইভ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে, তাই, আমার হঠাৎ মন খারাপ হ'য়ে গেলো আমি যেন একটা আবছায়ায় প্রবেশ করেছি, যেখানে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া

উঠছে চারদিক থেকে। ধোঁয়াটে, ধূসর সব মুখ—ভেসে চলেছে অবিরাম আমার পাশ দিয়ে—একটানা আট ঘণ্টার কাজের চাপে মুছে-যাওয়া, যেন ম'রে যাওয়া সব মুখ। সে-সব মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই—দিনের পর দিন একই বাঁধা-ধরা মাপাজোকা কাজ করতে হ'লে যে-ক্লান্তি আসে, কাজের মতো সেটাও একটা অভ্যেস হ'য়ে পড়ে—অভ্যেসের কাজ, অভ্যেসের ক্লান্তি।—দুটোই নিশ্চেতন, অনুভবহীন। না, ক্লান্ত নয়; সে-সব ধূসর ধোঁয়াটে মুখ একটা শূন্যতার মতো—যেন তারা অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে; তারা যে চলেছে, তাদের সামনে কোনো লক্ষ্য নেই। চোখ, সারাদিন ভরে দলিল আর হিসেবের উপর ন্যস্ত, আলো-নিবে যাওয়া, দৃষ্টিহীন—এখন আর কী তারা দেখতে পাবে সামনে? গলায়-মলিন চাদর জড়ানো ঐ বাঙালি বাবুটি—সে কি কিছু দেখতে পাবে বাইরে, তার মনের মৃত ধূসরতা ছাড়া? তার চোখ তাকিয়ে আছে স্থির, সে কিছু দেখছে না। একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে খটখট জুতোর আওয়াজ করতে করতে বাবুটিকে পার হ'য়ে গেলো, তার রং-উঠে-আসা ঠোঁট যেন হতাশায় পরস্পরের উপর বুজে আছে, শক্ত অবশ তার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরে আছে চামড়ার ব্যাগ, ফেঁপে-ওঠা চুলের নিচে তার মাথার মধ্যে টাইপ'রাইটারের ধাতব শব্দ। স্যুট-পরা একজন মাদ্রাজি আস্তে আস্তে চলেছে—তার মুখে চুরোট, ঝুলে পড়া গোঁফে ঘেরা তার ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি—হয়তো সে আজকের দিনের মধ্যে তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট অনেকটা ফাঁপিয়ে তুলেছে, তার অন্তরে টাকাময় শূন্যতা। দ্রুতগতি কোনো জন্তুর পালের মতো মোটরগুলো প্রায় নিঃশব্দে একটা আর একটার পশ্চাদ্ধাবন করছে—তাদের মধ্যে উপবিষ্ট বড়ো সাহেবদের প্রবল মদ্যতৃষ্ণা ছাপিয়ে উঠেছে অন্য সব চিন্তাকে—কিন্তু আর কী চিন্তাই বা থাকতে পারে, যা তারা আপিসের দেরাজে দিনের কাগজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে রেখে আসেনি? আর-কোন জিনিশে তাদের মন এখন সাড়া দিতে পারবে, হুইস্কির তীব্রতায় ছাড়া?

একটা মিছিল! বরং দীর্ঘ একটা শবযাত্রা, মৃত্যুর পদচারণা। এই সব মৃত হৃদয়—অসাড় আঙুল, আর অন্ধ চোখ; ধূসর, আলোকহীন মুখের পর

মুখ—কোনো আগুন কি তাদের স্পর্শ করবে না, জেগে উঠবে না প্রাণ—চোখের আলো হ'য়ে, অঙ্গুলিবৃন্তে চেতনা হ'য়ে? এই কি আমাদের পৃথিবী, আমাদের জীবনের শেষ কথা—এই কোলাহল আর ব্যস্ততা, দিনের পর দিন জীবিকার পাকে ঘুরে বেড়ানো, বাণিজ্যের স্বর্ণষণ্ডের পায়ে এই হীন, এই লোলুপ আত্ম-সমর্পণ?

আর হঠাৎ, রাস্তার পশ্চিম দিকের আকাশে মাথা-উঁচোনো বিরাট দুই বাড়ির মাঝখানে, আমার চোখের উপর ঝলসে উঠলো চাঁদ, রুপোলি চাঁদের বাঁকা টুকরো সন্ধ্যার শুদ্ধ নীল আকাশে, যেন কোনো দূর, শান্ত হাসির মতো, যেন এক অনির্বচনীয় শান্তির দৃশ্যমান ইঙ্গিত। আমি চমকে উঠলুম, থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। এমন একটা বিস্ময়, আঘাতের মতো! এখানে চাঁদের দেখা পেতে আশা করা যায় না, সারাদিন ধরে ফেনিয়ে-ওঠা এই নগর-কেন্দ্র, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টায় ম'রে যাচ্ছে, এই সব বিশাল দেয়ালের পরিধির মধ্যে, এই উন্মাদ—মনে হয় যেন অকারণ—কোলাহলের আবহাওয়ায়। চাঁদকে যেন এখানে মানায় না, সে যেন এখানে ভুল ক'রে চ'লে এসেছে। আমি আবার চোখ তুলে তাকালুম চাঁদের দিকে—ঐ তো ছোট্ট একটু আলোর রেখা, তাকে ঘিরে পূর্ণিমার আভাস। ঐ তো ছোটো চাঁদ—তার মধ্যে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে হাসছে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে—আমাদের জীবন-নাট্যের দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে, আমাদের চেষ্টা আর সংগ্রাম, ইচ্ছা আর জল্পনা, ভালবাসা আর হতাশা দেখে। সে তো সব জানে—সে তো দেখে এসেছে সব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, সেই জন্যই তার মুখে ঈষৎ ক্লান্তির আভাস। তবু তার মুখে সেই শান্ত হাসি—যেন এই সমস্ত ব্যাপারটা এত দুঃখের না-হ'লে ঠাট্টার হ'তো—সব কলরব ছাড়িয়ে অনেক উপরে সেই আশ্চর্য শান্তি, এই প্রেত জনতা থেকে অনেক, অনেক দূরে। হঠাৎ আমার স্নায়ুতে-স্নায়ুতে রোমাঞ্চ খেলে গেলো; কে যেন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'ভয় নেই।'

না, ভয় নেই; চাঁদ আছে। এখানেও, এই ক্লাইভ স্ট্রিটেও আছে। আমরা যারা শহরে থাকি, তারা চাঁদকে বিশেষ লক্ষ্য করি না; আমাদের ধারণা, চাঁদের শোভা সেখানেই, প্রকৃতির যেখানে নিজস্ব রাজত্ব—পল্লীর উন্মুক্ত প্রান্তরে বা সমুদ্রের দৈগন্তিক লীলায়। এটা আমাদের একটা গতানুগতিক ধারণা, যা আমরা বংশপরম্পরায় অবাধে বিশ্বাস করে এসেছি, বিশ্বাস করাই সহজ ব'লে। কিন্তু চাঁদকে যে এখানেই দেখতে হয়, এই বাণিজ্যধানীতে, কুবেরকে উৎসর্গিত মন্দির থেকে মন্দিরে প্রতিফলিত দীর্ঘ ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে—এখানেই তো সবচেয়ে বাণীময় হ'য়ে ওঠে চাঁদের শান্তি আর শুভ্রতা। পল্লীর নির্জনতায় তার প্রসারে চাঁদ যায় হারিয়ে; যেখানে প্রকৃতি তার উদাস আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে আকাশে-আকাশে, সেখানে চাঁদ বাহুল্যমাত্র। আমরা, যারা শহরের লোক;—কাড়াকাড়ি ক'রে, মারামারি ক'রে, প্রতি মুহূর্তে ঠেলাঠেলি ক'রে, কঠিন চেষ্টায় যাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়; আমরা, যাদের রক্তের বিবর্ণ পাণ্ডুরতা ধূসর হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের মুখে; হৃদয় যাদের শুকিয়ে গেছে ধুলো হ'য়ে—আমাদেরই তো সবচেয়ে বেশি দরকার অন্তরে চাঁদের স্পর্শ, আমাদেরই জন্য তো চাঁদের শান্তি। নেশার ঘোরে কেটে যায় দিনের পর দিন—ক্ষুধা শাণিত হ'য়ে ওঠে; লোভ নিজেকে বিস্তার করার জন্য ছটফট করে; অবান্তরতায়, তুচ্ছতায় সংকীর্ণ জীবন যখন নিজের বিনাশে নিজেই উদ্যত—এমন সময় একদিন চাঁদ ওঠে আকাশে, মনে করিয়ে দেয় আরো-কিছু আছে।

হঠাৎ এক টুকরো পাৎলা মেঘ এসে চাঁদের খানিকটা ঢেকে ফেললো—যেটুকু বেরিয়ে রইলো, রক্তিম দীপশিখার মতো জ্বলছে। চাঁদ, আমি মনে-মনে বললুম, তোমার ঐ শিখা থেকে আমি জ্বেলে নিলুম আমার মন, সে-আগুন নিববে না। যদিও মনের কোনো গোপন অংশে আমি জানতুম যে ও-কথা সত্য নয়, হ'তে পারে না—কাল সকালেই হয়তো উঠবে কোনো কোলাহলের হাওয়া, এক ফুঁয়ে নিবে যাবে এই স্পর্শ। কিন্তু তখনকার মতো আমি

যেন নিজের মধ্যে অনুভব করলুম চাঁদের সত্তা, এক হ'য়ে গেলুম আমি চাঁদের সঙ্গে।

ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগলো যেন কার আদরের মতো। নির্জন ফাঁকা ক্লাইভ স্ট্রিট দিয়ে আমি একমাত্র চলেছি, ফুটপাতের পাথরের উপর আমার জুতোর অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে। কী মুক্তি! এই ঠাণ্ডা হাওয়া, এই রাত্রি। অন্ধকারকে আমি আমার শরীর দিয়ে অনুভব করতে পারছিলুম নরম কোনো স্পর্শের মতো; ক্ষীণ গ্যাসের আলো প্রশস্ত রাস্তাকে জড়িয়ে ধরতে পারছে না —এক ফোঁটা আলো নেই দু-পাশের এতগুলো বাড়ির কোনো-একটিতে। যেন রাত্রির সব গোপন কথা লুকিয়ে আছে এই লঘু অন্ধকারের পরতে পরতে— গ্যাসের আলো যেখানে ফুটপাতে পড়েছে, দূর থেকে মনে হয় যেন লেফাফা-আঁটা কোনো খবর। কী সে-খবর, তা আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি খুশি যে অন্ধকারের গায়ে সংগোপনে রাত্রির লিপি আমি পড়তে পারি না। অবাক হ'তেই আমার বেশি ভালো লাগে; এই রহস্যের চেতনাতেই আমার আনন্দ। আর, কী আশ্চর্য, এই স্তব্ধতা আর অন্ধকার, যেন এক জাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত ক্লাইভ স্ট্রিট। একটু আগেও এখানে ভিড় আর ধরছিলো না, এখন তা দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে, এখন কাছাকাছি আমি ছাড়া আর একটি লোক নেই। আমার বিশ্বাস করার ইচ্ছে হ'লো যে ঘণ্টা খানেক আগে, এখান দিয়ে যাবার সময়, আমি যা দেখেছিলাম তা প্রেতের মিছিল, সেই সব লোকের কখনো সত্যিকার অস্তিত্ব ছিলো না। তারা লাফিয়ে উঠেছিলো মাটি ফুঁড়ে কোনো মায়াবী দানবের ইঙ্গিতে, মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড জাঁকজমকে কুচকাওয়াজ ক'রে মিলিয়ে গেলো। আধো-অন্ধকারে যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে এই রাস্তা, রাত্রির হাওয়া যেতে যেতে তাকে চুমো দিয়ে যাচ্ছে—কী ক'রে এখন বিশ্বাস করা যায় তার দিনের বেলাকার রূপ, এ-কথা মনে না-করা কী ক'রে সম্ভব যে সেটা আমাদেরই মনের বিকৃত কল্পনা মাত্র, কোনো উন্মাদের প্রলাপ, যা আমরা মূঢ়তার বশে মেনে নিয়েছি সত্য ব'লে। সারাদিন এই রাস্তা ধ্বনি-তরঙ্গে আলোড়িত—এখন আর সে কি তার কিছু মনে রেখেছে?

সব কি মিলিয়ে যায়নি, শূন্য হয়ে যায়নি—যেন কখনো তা ছিলো না? ট্র্যাফিকের গর্জনে আর লোকের মুখের কথায় হানাহানি—মুখ থেকে মুখে; টেলিফোনের তারে-তারে সঞ্চরমাণ লক্ষ-লক্ষ কথা—স্বার্থে-স্বার্থে সংঘর্ষ, ছদ্ম-বেশী লোকের দীনতা, নিজের ফন্দি গোপন রাখার সওদাগরি চাতুরী—পার্সেণ্টেজ, ডিভিডেণ্ড, অন্তরালবর্তী অসংখ্য লোকের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা—আর এখন সব চুপ, একেবারে চুপ, শুধু আমার পায়ের শব্দ নিজের পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে। আমার চারদিকে যতগুলো বাড়ি দেখছি, তার প্রত্যেকটি যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ জগৎ, সারাদিন ধরে মৌচাকের ব্যস্ততা সেখানে, হাজার লোক অন্নের গ্রাস কুড়িয়ে নিচ্ছে, সুখেদুঃখে জড়ানো হাজার জীবন পিণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে কয়েকজন অদৃশ্য ধনীর আত্মস্ফীতির প্রয়াসের চাপে; এক মাত্র এক বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে প্রত্যহ লেনদেন হচ্ছে কোটি-কোটি টাকার। কিন্তু এখন সে-সবের কিছুই নেই; এখন শুধু রাত্রির রহস্য আর স্তব্ধতা। বাড়িগুলো তার অন্ধকার শূন্য জঠর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কিসের প্রত্যাশায়। মনে হয়, যেন তাদের পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে; রাত যখন গভীর হবে, তারাদের নিচে চলবে এদের কানাকানি, দিনের স্মৃতি মন্থন ক'রে তারাও হয়তো হাসাহাসি করবে নিজেদের মধ্যে—মানুষের সব চেষ্টার অন্তিম নিষ্ফলতা নিয়ে। এই বাড়িগুলোর মধ্যেও যেন গোপন রয়েছে চাঁদের ক্লান্তি।

যদি কেউ মনে করেন যে নিজের লাভের জন্য পৃথিবীময় টাকা খাটিয়ে তিনি মানুষের সভ্যতাকে সাহায্য করছেন, বণিকবৃত্তিকে একমাত্র ধর্ম ক'রে তোলা যাঁর তপস্যা, তিনি যেন একবার সন্ধ্যের পর তাঁর ক্লাইভ স্ট্রিটকে দেখে আসেন, যখন ও-রাস্তা একেবারে শূন্য ও নীরব হ'য়ে যায়। তাহ'লে তিনি জানবেন। তিনি জানবেন, ক্লাইভ স্ট্রিটই তার নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে বিদ্রূপ—বিদ্রূপের চেয়েও বেশি—গভীর শান্তি। চাঁদের আশ্চর্য শান্তি, তার মধ্যেও তা রয়েছে। ক্লাইভ স্ট্রিটকে আমরা জানি কলকাতার—শুধু তা-ই বা কেন?—বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড বলে, যেখান থেকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে, যে-রক্তে লালিত হয় জীবন। হ্যাঁ ক্লাইভ স্ট্রিটই তো আমাদের

বাঁচিয়ে রেখেছে—বরং বর্তমান সময়ের এমনিই ব্যবস্থা যে ক্লাইভ স্ট্রিট বাদ দিয়ে আমাদের বাঁচার উপায় নেই। যদি রক্ত আসে অতি ক্ষীণস্রোতে, জীবন চলে মৃদু তালে—এক কথায়, জীবন যদি শুধু হয় জীবনের দেনাপাওনা, তাহ'লে শুধু ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে পারি, তা ছাড়া আর কী। এটুকু যে হচ্ছে, তারই জন্য ধন্যবাদ ক্লাইভ স্ট্রিটকে। আজকালকার দিনে আমাদের প্রত্যেককেই দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছে বণিকরাজকে, তা থেকে কারো মুক্তি নেই—যতই পরোক্ষে, যতই সূক্ষ্মভাবে হোক—সবারই উপর চরম প্রভুত্ব করছে ক্লাইভ স্ট্রিট। আমি লেখা যার পেশা, ক্লাইভ স্ট্রিটের সঙ্গে আপাতত যার কোনোই সম্বন্ধ নেই—আমার পক্ষেও ক্লাইভ স্ট্রিটকে এড়ানো অসম্ভব। পূর্ব যুগে আমাকে অলংকৃত করতে হ'তো কোনো রাজসভা—কোনো-একজনের কাছে সে বশ্যতা আমার ভালো লাগতো না; আজকের দিনে এই দুর্বোধ জটিল বণিক-তন্ত্রের সঙ্গে আমারও জীবিকা সমস্যা জড়িত। বিশেষ একজন রাজার অধীন হওয়া ভালো না; কিন্তু এই বণিককুলের যারা ক্রেতা, সেই বিজ্ঞাপন-বিশ্বাসী চিন্তা-শক্তিহীন জনসাধারণের অধীনে থাকাই কি তার চেয়ে ভালো?

যা-ই হোক, ক্লাইভ স্ট্রিট সম্বন্ধে এটাই শেষ কথা নয়; আমরা যেন তার চাঁদ-সত্তাকে মনে রাখি, তার রাত্রিময় রহস্যকে; রুটিন বাঁধা একঘেয়ে কাজ দিনের পর দিন করতে হ'লে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যেতে বাধ্য; কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর যা ব্যবস্থা, তা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কী—বেঁচে তো থাকতে হবে সবার আগে। স্বর্ণষণ্ডের পূজায়, তাহলে নিজের একটি অংশকে বলি দিতেই হবে—কিন্তু যেটুকু ঠিক দরকার, যেটুকু না-দিলেই নয়, তার বেশি যেন আমরা না দিই। জোড়াতালি দিয়ে দু-দিকই বজায় রাখার চেষ্টা—সেটাই আজকালকার মানুষের বাঁচার উপায়। কাজ যতক্ষণ, ততক্ষণ একটা অস্তিত্বহীনতা; যে মুহূর্তে তা শেষ হ'লো, সে মুহূর্তে নিজের জীবন। আমার নিজের জীবন! অবসরের সময়টা আমার, সেটুকু সময় আমি বাঁচবো। তখন রাত্রির ক্লাইভ স্ট্রিটের ছায়ালোক, হৃদয়ে এই চাঁদের স্পর্শ।

'প্রবন্ধ সংকলন'

ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বিশ্ব-প্রবাহের যে অন্ধ আবর্তে অরণ্যে বনস্পতির জীবন গড়িয়া উঠিতেছে ঠিক সেই একই প্রবাহে মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে একথা বলিলে অবশ্য মানুষ তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে, কারণ সে চেতনশীল বুদ্ধিজীবী তাহার জীবনকে সে অনেকখানি দিতে চায় আত্মনিয়ন্ত্রণের গৌরব। এ গৌরব মানুষের অনেকখানি আছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু অহঙ্কারের মোহ ভাঙিয়া গেলে দেখিতে পাই, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আমরা যত বড় করিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত, বাস্তবে কিন্তু সে তত বড় নহে। আমরা যাহা, তাহার খানিকটা আমাদের নিজেদের গড়া, আর বাকিটা প্রকৃতির বা বিশ্ব-প্রবাহের দান। এক্ষেত্রে কাহার দান কতটা তাহা কোনো গাণিতিক উপায়ে অংশ করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না কোনোটাকেই। আমি যাহাকে প্রকৃতির দান বলিয়াছি তাহা কি? তাহা একদিকে যেমন জল-বায়ু, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, তেমনি জাতি, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র। আমাদের জীবনের মূলে বেশী কম ইহারা সকলেই বাসা বাঁধিয়া আছে, কাহাকে আমরা একেবারেও উপেক্ষা করিতে পারি না। এই যে জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের কথা বলিলাম, ইহা নিতান্তই গোটা কয়েক 'কাব্যিক' কথা নহে,—আর্য-ভারতের ইতিহাস হইতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং বিন্ধ্য-হিমালয় পর্বত-শ্রেণীকে বাদ দিতে চেষ্টা করা শুধু অসঙ্গত নয়, অসম্ভব। বিরাট হিমালয় পর্বত শুধু পাষাণ-স্তূপের অচলায়তন নহে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে সে সচল, কারণ ভারতবর্ষের সমগ্র প্রবাহের ভিতর তাহার দান অনেক। ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন-প্রবাহে হিমালয়ের যে দান

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার অমোঘ প্রভাব কি কেহ অস্বীকার করিতে পারি? সুতরাং শুধু জাতি, ধর্ম বা রাষ্ট্রই আমাদের জীবন গড়িয়া তোলে না, জীবনের উপাদান সংগৃহীত হয় চারিদিক হইতে। ইহাদের সকলকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কাল-প্রবাহ,—সেই সমগ্র গতিকেই আমি সংক্ষেপে নাম দিয়াছি ইতিহাস। জীবন সম্বন্ধে একান্তভাবে একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি না লইয়াও একথা বলা চলে যে, আমাদের জীবন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্য প্রভৃতি সকল কলাসৃষ্টি ছুটিয়া চলে আমাদের এই সমগ্র ইতিহাসের তালে তালে। জীবনের এই সমগ্র ইতিহাসের সহিত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের যে এই গভীর যোগসূত্র তাহাকে বাদ দিয়া যখন আমরা সাহিত্য বা অন্যান্য সকল আর্টকে দেখিতে চাই একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে, তখন আমাদের সে দেখা হয় ভুল এবং অসম্পূর্ণ। তত্ত্ববুদ্ধি বা মতবাদের জোরে এই ইতিহাসের ধারাকে আমরা যেখানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চাই, সেইখানেই উঠিবে আপত্তি,—শুধু সাহিত্য-স্রষ্টাদের তরফ হইতে নহে, মহাকালের তরফ হইতেও।

কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন উঠিবে; মানুষের এক একটি জীবন সে কি শুধু ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের এক একটি বুদ্বুদ মাত্র? ইতিহাসই কি শুধু মানুষকে গড়িয়া তোলে, ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতে কি মানুষের কোন হাত নাই? মানুষের ব্যক্তিত্বের তাহা হইলে স্থান কোথায়? প্রবাহের টানেই যদি মানুষের জীবনধারা ছুটিয়া চলে এবং সেই ধারাতেই যদি গড়িয়া ওঠে সাহিত্য এবং অন্যান্য শিল্পকলা তাহা হইলে প্রতিভার স্থান কোথায়?

আমি ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি সেখানেই বলিয়াছি যে, ইতিহাসের ভিতরে খানিকটা থাকে প্রকৃতির দান, খানিকটা থাকে আমাদের ব্যক্তিসত্তার দান। জাতি, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাহা আমরা জন্মিয়াই লাভ করি উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাকেও আমি প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর (environment) দান বলিয়া মনে করি; কারণ ইহাদের কাজ যে শুধু আমাদের সচেতন মনের উপরে তাহা নহে, তাহাদের কাজ আমাদের রক্তে—অস্থিতে—মজ্জায়। ইহারাই একত্রে যুক্তি করিয়া

আমাদের দেহ-মনকে গড়িয়া তুলিবার ভার লয়, এবং আমরা যাহাকে আমাদের ব্যক্তিত্ব বলি তাহাকে যদি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দেখা যাইত এবং সেই ভাঙা অংশগুলিকে চিনিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং ইতিহাসকে কোথাও পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করিবার সাহস হইত না। গড্ডলিকা-প্রবাহে আমরা যাহারা সাধারণ জীবন-যাত্রায় গা ভাসাইয়া চলি তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া চলে, কারণ তাহাদের বেলায় ইতিহাস এবং ব্যক্তি-পুরুষের বিরোধ অনুভবযোগ্যই নহে; সুতরাং জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথাই আলোচনা করা যাক। আমরা একথা বলিতে পারি যে ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাসধারাকে বদলাইয়া দিয়াছেন। মানুষের চিরাচরিত চিন্তাপদ্ধতির ভিতরেই তিনি জাগাইয়াছেন একটা বিদ্রোহ। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এ সমস্ত কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বুদ্ধদেবের হিমাচল-সদৃশ দৃঢ়, বিরাট এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তি-পুরুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও বলিতেছি, বুদ্ধদেবই শুধু ইতিহাসকে গড়িয়া গিয়াছেন, ইতিহাস বুদ্ধদেবকে কিছুই গড়িয়া তোলে নাই, একথা স্বীকার করিব না। আমার মনে হয় বেদ-বিধির যে রক্তকলুষ শান-বাঁধান পথে সদম্ভে চলিতেছিল কর্মকাণ্ডে-ভরা একটা ধর্মমত, ভারতীয় জন-সাধারণের ভিতরে বহুদিন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে জাগিতেছিল বিদ্রোহ; উপনিষদ্‌গুলির ভিতরেই আমরা শুনিতে পাই সেই বিদ্রোহের একটা সুর ব্রহ্মবাদের প্রাধান্য ঘোষণায়, সেই বিদ্রোহেরই অপর একটি সুর রক্তমাংসে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়া। রাজসুখে বিলাসমগ্ন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হঠাৎ জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মৃতলোক দেখিতে পাইয়া সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া বেদধর্ম-বিরোধী নবধর্মের প্রবর্তন করিলেন, ইহাই বুদ্ধদেবের যথার্থ জীবন-কথা নহে। তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে, তৎকালে ভারতবর্ষে এই বেদধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যাই ছিল বেশী; সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বেদবিদ্রোহী ধারাটি অপেক্ষা বেদবাদী ধারাটি ছিল প্রবল; কিন্তু এই যে প্রবল ধারাটির সম্মুখে

দাঁড়াইয়া তাহার গতিরোধ করিবার সাহস এবং বীর্য তাহাই ছিল বুদ্ধদেবের ব্যক্তিসত্তার ভিতরে, এইখানেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা; এবং এইখানেই মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিতরে আমরা প্রকৃতির দান—ইতিহাসের আবর্তনের অতিরিক্ত আর একটি শক্তিকে মানিতে বাধ্য হই, ইহা মানুষের নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু ইতিহাসের যে ক্ষীণ বিদ্রোহী ধারাটিকে বুদ্ধদেব তাঁহার ব্যক্তিত্বের বীর্যমহিমায় ছুটাইয়া দিলেন বেদধর্মের এমন প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে, তাহাকেও মানুষের ব্যক্তিত্বের মহিমা আর বেশী দূর টানিয়া লইতে পারিল না, তাহাকেও আবার টানিয়া লইয়া চলিল ইতিহাস, তাই ভারতবর্ষের বৌদ্ধমত ক্রমান্বয়ে উঠিতে লাগিল ঔপনিষদিক মতবাদের অনুরূপ হইয়া, তিব্বতের ইতিহাস তাহাকে গড়িয়া-পিটিয়া লইল লামা-ধর্মরূপে, চীনের ইতিহাস, জাপানের ইতিহাস প্রত্যেকেই তাহাকে গড়িয়া লইয়াছে আপনার মত করিয়া।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে কথা খাটে, যীশুখ্রীস্টের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণের ভিতরে কেহ কেহ যীশুখ্রীস্টের রক্ত-মাংসের দেহটির সত্য মানিতেও নারাজ হইতেছেন। তাঁহারা বলেন, যীশুখ্রীস্ট বলিয়া কোন কালে কোন লোক ছিলেন না। প্রাচীন ইহুদীধর্মের ভিতরে একটু একটু করিয়া জাগিতেছিল সংস্কারের প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিতরে ইহুদীধর্মকেই পটভূমি করিয়া জাগিতেছিল নূতন বিশ্বাস, নূতন ধর্মমত, এবং একদল ধর্মপ্রচারক প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন সেই নূতন বিশ্বাস ও মত। তৎকালীন সেই সকল ধর্মপ্রচারকের দেহমনের একীভূত মূর্তির যদি কোন কল্পনা করা যায়, তবে যীশুখ্রীস্ট তাহাই। যীশুখ্রীস্টের রক্তমাংসের দেহে যে আবির্ভাব তাহাকে মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে, উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যীশুখ্রীষ্টের যথার্থ জীবন-কথা। তবে ইতিহাসকে অস্বীকার না করিয়াও ব্যক্তিত্বকে যে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া দেখা যাইতে পারে, সকল ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রসংস্কারক এবং সমাজ-ব্যবস্থাপক সম্বন্ধেই সেকথা প্রযোজ্য। যে একান্ত প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যীশুখ্রীস্ট তাঁহার মত এবং

বিশ্বাসকে জীবনের শেষবিন্দু রক্ত দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার অনন্যসাধারণত্বের পরিচয়।

আরও একটি দিক দিয়া ইতিহাসের ধারার সহিত ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধটিকে বোঝা যাইতে পারে। ইতিহাস যে সর্বদা অনুকূল স্রোতেই আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তোলে তাহা নহে, মানুষের জীবন-গঠনে তাহার কাজ প্রতিকূল স্রোতেও কম নহে। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয় বেদাচারের প্রতিকূলস্রোত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংগঠনে কম সাহায্য করে নাই। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, বাঙলাদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ একদিকে যেমন অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তের কামনা, অন্যদিকে তেমন পাষণ্ডীদের প্রাচুর্য। ইহা শুধু ভক্তের কথা নহে, ইহাই যথার্থ ইতিহাসের কথা। আসল কথা এই, মানুষের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসকে অনেকখানি ছাপাইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু সে ইতিহাস হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। বড় ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর ইতিহাসকে আপনার ভিতরে সংহরণ করিয়া লয়,—ইতিহাসে তাহার দানও হয় বৃহৎ। কিবা ধর্মক্ষেত্রে, কিবা রাষ্ট্রে, কিবা সমাজে এমন কোথাও কোনো দিন এমন ব্যক্তিপুরুষের আবির্ভাব ঘটে নাই, যাঁহার আবির্ভাব ইতিহাসের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত নহে। সৃষ্টির ভিতরে কোন বস্তু বা ঘটনাই কখনো একান্তভাবে খাপছাড়া নহে।

'সাহিত্যের স্বরূপ'